দাম : বারো টাকা

ভারতে ওমিক্রন ভাইরাসের বিপদ কতটুকু?
— পৃঃ ২৪

স্বস্তিকা

দেশ ও জাতির সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা ক্ষমার অযোগ্য
— পৃঃ ১১

৭৪ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।। ১৩ ডিসেম্বর, ২০২১।। ২৬ অগ্রহায়ণ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

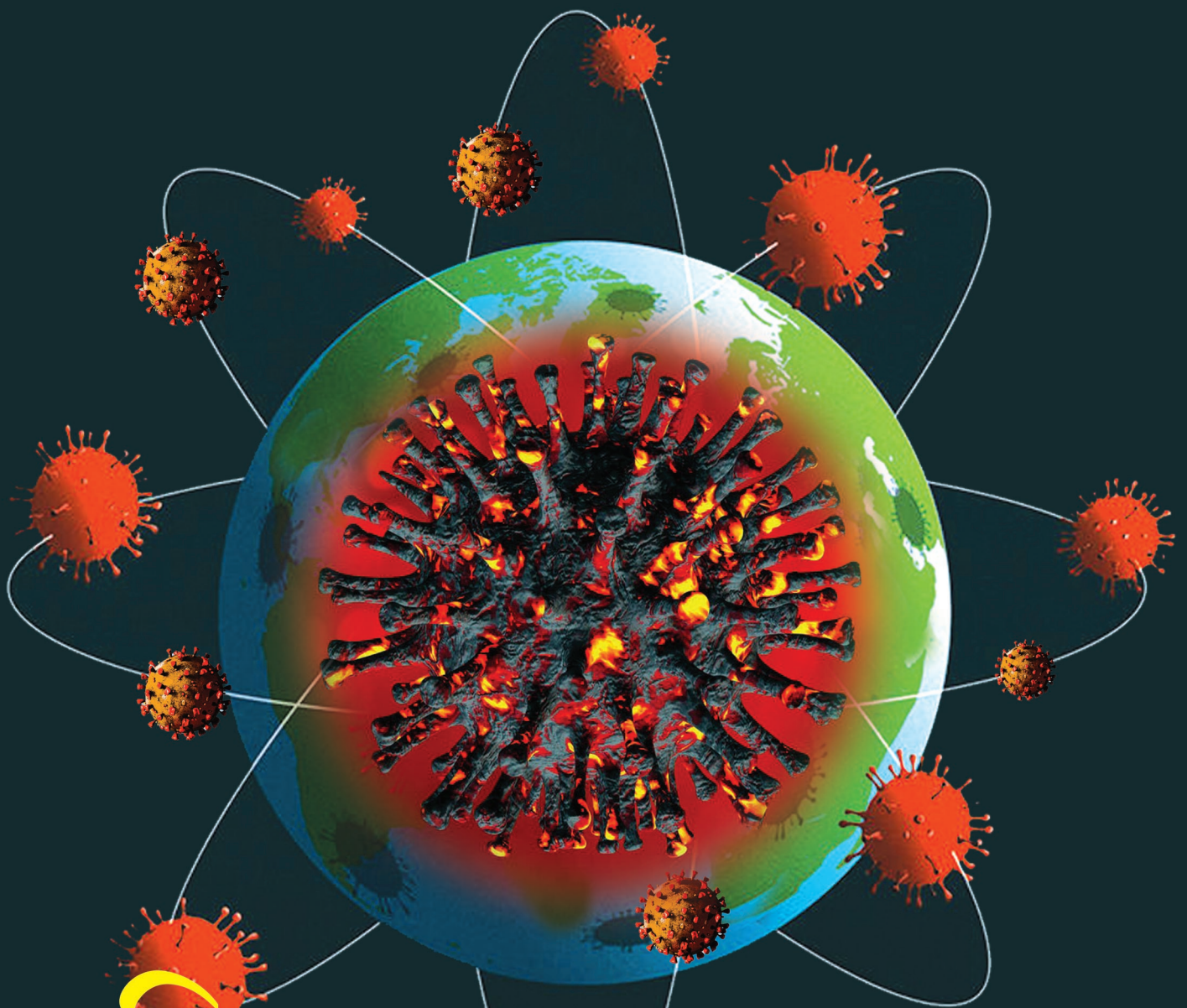

ওমিক্রন

দ্রুত সংক্রমণ ঘটাতে পারে করোনার এই নতুন রূপ

যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তারা কি আবার ওমিক্রনে আক্রান্ত হতে পারেন?

যারা করোনার দুটি ডোজ ভ্যাকসিন নিয়েছেন তারা কি ওমিক্রনের শিকার হতে পারেন?

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE™ NEW AGE PANELS
SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১৩ ডিসেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

কেন ইতিহাস মুছতে চাইছেন মমতা, শিল্প আগ্রহ না সোনিয়া খতম? ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

গরিব দিদি, ধনী বউদি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

উন্নয়নের গাড়ির ব্রেক কষা আরও কমাতে হবে
◻ চেতন ভগত ◻ ৮

ভোট-সন্ত্রাস বন্ধে আদৌ আন্তরিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

দেশ ও জাতির সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা ক্ষমার অযোগ্য ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ১১

ত্রিপুরায় গেরুয়া ঝড় বিরোধীরা ধূলিসাৎ
◻ রামানুজ গোস্বামী ◻ ১৩

ইলা মিত্রের নাম বামপন্থীরাও মনে রাখেননি
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৪

দিবাস্বপ্নের ঘোরে বেসামাল তৃণমূল সুপ্রিমো
◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ১৫

ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি
◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ১৭

বিশ্বজুড়ে ওমিক্রন ত্রাস : কী বলছে হু ◻ অনামিকা দে ◻ ২৩

ভারতে ওমিক্রন ভাইরাসের বিপদ কতটুকু
◻ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ◻ ২৪

ওমিক্রন যত দ্রুত ছড়াচ্ছে তার ভয়াবহতা তত কমছে
◻ ডাঃ অর্চনা মজুমদার ◻ ২৭

মহাকবি কালিদাসের মৃত্যুরহস্য ◻ ড. অশোক দাস ◻ ৩১

ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবলীপুরমের উপকূল মন্দির
◻ কৌশিক রায় ◻ ৩৪

প্রতিপদে নিরুদ্ধ নটিনী বিনোদিনী ◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ৩৫

ডার্বি জেতার হ্যাট্রিক ◻ নিলয় সামন্ত ◻ ৩৯

বিজ্ঞান শিক্ষায় ঔপনিবেশিক দাসত্বের ইতিহাস
◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৪৩

প্রকৃতি নির্ভর জীবনযাপন এবং পূর্ণ স্বাস্থ্যের ভিত্তি
◻ ড. অশোক কুমার বার্ষ্ণেয় ◻ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৫০

প্রকাশিত হবে ২০ ডিসেম্বর ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২০ ডিসেম্বর ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

কাছে-পিঠে সপরিবারে

বছর শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। শীতও কড়া নাড়ছে দরজায়। এই সময় লাগেজ গুছিয়ে কাছেপিঠে কিংবা দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়ার জন্য বাঙ্গালির মন উড়ু উড়ু করে। আগামী সপ্তাহের স্বস্তিকায় থাকবে কাছাকাছির মধ্যে তিন-চারদিনের জন্য ঘুরে আসার মতো কয়েকটি ঠিকানার সন্ধান। প্রতিটি জায়গায় কীভাবে যাবেন এবং কোথায় থাকবেন তার বিস্তারিত আপডেট সহ প্রকাশিত হবে আগামী সপ্তাহের স্বস্তিকা।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from :

A

WELL WISHER

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আমরা করিব জয়

২০১৯-এর মার্চ-এপ্রিলে করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাব সমগ্র বিশ্বকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। কয়েক কোটি মানুষের প্রাণহানি, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকাচ্যুতি সারা বিশ্বে হাহাকার নামাইয়া আনিয়াছিল। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতেও ইহার মোকাবিলার সমস্ত ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সবচাইতে বড়ো কথা, সমগ্র বিশ্বের অর্থব্যবস্থায় ধস নামিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও ভারত যেইভাবে ইহার মোকাবিলা করিয়াছে, তাহা সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত হইয়াছে। ইহার কারণ হইল, ভারত সরকারের সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইহার সঙ্গে সমগ্র দেশবাসীর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন। সারা বিশ্ব সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি কথা কীভাবে দেশবাসী আন্তরিকতার সহিত সমর্থন করিয়াছে। তাহারা ভারতবাসীর সঙ্ঘবদ্ধতায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে। উন্নত দেশগুলিতে করোনা মোকাবিলার নিয়মনীতি কার্যকর করিতে যেইখানে সামরিক বাহিনীকে শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, সেইখানে ভারতে প্রধানমন্ত্রীর একটি আবেদন দেশবাসী আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করিয়াছে। বিশ্ববাসী আরও বিস্মিত হইয়াছে যখন তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে করোনা প্রতিবিধান ব্যবস্থায় ভারত সরকারের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীও শামিল হইয়াছে। সরকারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও দেশ জুড়িয়া সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের সেবাকার্যের তাহারা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে। করোনা মোকাবিলায় সতত ক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের প্রধানমন্ত্রী 'করোনা যোদ্ধা' বলিয়া অভিহিত করিয়া তাহাদের সম্মানিত করিয়াছেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান-সহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে 'করোনা যুদ্ধের সেনাপতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করিতেছেন, ভারত সরকারের সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দেশবাসীর সম্মিলিত সহযেগিতার কারণেই করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউ রুখিয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

করোনা মহামরীর বিপর্যয় কাটাইয়া বিশ্ব যখন পুনরায় স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিতে শুরু করিয়াছে তখনই করোনার নূতন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর চল্লিশটির বেশি দেশে তাহা সংক্রমিত হইয়াছে। ভারতেও বেশ কয়েকজনের সংক্রমিত হইবার কথা জানা গিয়াছে। আইআইটি কানপুরের গবেষকদের অনুমান জানুয়ারিতেই তাহা প্রবল হইবে ভারতে। তাহা লইয়া ক্রমেই বাড়িতেছে আশঙ্কা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শীর্ষ বিজ্ঞানী সৌম্যা স্বামীনাথন জনিয়েছেন, কোভিড-১৯-এর নূতন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন লইয়া আতঙ্কিত না হইয়া সমগ্র বিশ্বের ইহার মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি পরিষেবা বিষয়ক প্রধান মাইক রায়ান বলিয়াছেন, কোভিড মোকাবিলায় বিশ্বের হাতে এখন পর্যন্ত 'খুবই কার্যকর ভ্যাকসিন' রহিয়াছে। আরও ব্যাপকভাবে সেইসব ভ্যাকসিন বিতরণের দিকেই সব দেশের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।' তাহা সত্ত্বেও কিছু সংবাদমাধ্যম ভীতির বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে। খুবই আনন্দের বিষয় যে, তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় ভারত সরকার ইতিমধ্যেই দেশের একশত কোটি নাগরিকের টিকাকরণ সম্পন্ন করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল, প্রধানমন্ত্রীকে অপদস্থ এবং দেশের ভাবমূর্তি মলিন করিবার জন্য বিরোধীশক্তি দেশের মধ্যেই সক্রিয় রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার-সহ বিরোধীরা প্রথমাবধি কেন্দ্রের সহিত অসহযোগিতা করিয়াছে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা সেই বিশেষ সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকায় কোভিডবিধি কার্যকরী করিতে দুর্লক্ষ্য করিয়াছে। বিশ্ব মহামারী মোকাবিলায় ইহাদের ভূমিকা খুবই লজ্জার। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারত সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপে এবং দেশবাসীর সহযোগিতায় আমরা করোনার এই নূতন ভ্যারিয়েন্টকেও অবশ্যই জয় করিতে পারিব।

সুভাষিতম্

ক্রোধঃ প্রীতিপ্রনশ্যতি মানো বিনয়নাশনঃ।

মায়া মিত্রাণি নাশয়তি লোভঃ সর্ববিনাশনঃ।।

ক্রোধ প্রীতি নষ্ট করে ফেলে, অভিমান বিনয়কে নষ্ট করে দেয়, মায়া মিত্রতা নষ্ট করে দেয় আর লোভ সবকিছুকেই নষ্ট করে ফেলে।

কেন ইতিহাস মুছতে চাইছেন মমতা, শিল্প আগ্রহ না সোনিয়া খতম?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

উপরের প্রশ্নটা করতেই পরিচিত তৃণমূল নেতা বললেন 'দুটোই'। তাঁর কথায় শিল্প রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আর সোনিয়া হটাও 'দেশ বরবাদি' বন্ধের জন্য। বিরোধীরা বলেন আসল কথা 'নিজের জন্য আর নিজের পরিবারের জন্য।' এটা খুব দায়িত্বশীল মন্তব্য বলে আমার মনে হয় না। বিরোধীরা কী বলবেন। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ মমতাতেই আস্থা রেখেছেন। এই মুহূর্তে মমতার না বলা স্লোগান 'সোনিয়া হটাও দেশ বাঁচাও'। কয়েক বছর আগেও রাহুল দুপুরের খাবার খেয়েছেন কি না খোলা মঞ্চে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মমতা। নিজের জীবনীতে দ্বর্থহীনভাবে জানিয়েছেন তাঁর দুই গুরুর কথা— 'প্রফুল্ল সেন আর রাজীব গান্ধী'। রাজীব রাহুলের পিতা। সোনিয়া তাঁর স্ত্রী যাঁকে 'কুইন মাদার' বলে মনে করেন মমতা। সে সব এখন ইতিহাস।

১৯৯০ সালে সিপিএম মমতাকে মেরে ফেলতে পারে ১৬ আগস্টের দু'দিন আগে মমতাকে সতর্ক করেছিলেন রাজীব। মমতা তাঁর বারণ শোনেনি। স্থানীয় সিপিএম ক্যাডার লালু আলম লোহার রড নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। এক সুতোয় বেঁচে যান মমতা। এরপরেই মমতাকে যুব কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে নিয়োগ করেন রাজীব।

শোনা যায় লালু আর তার দাদা বাদশাহ আলম এখন তৃণমূলের আশ্রিত। সিপিএম নেতৃত্বের বিরাগভাজন হয়ে ধাক্কা খাওয়ার পর বাদশাহকে এখন তৃণমূলে ঠাঁই দিয়েছেন মমতা।

এটাই মমতা। ভাবেন একরকম। বলেন একরকম। করেন একরকম। এহেন নেতাকে বোঝা যে সহজ নয় তা যেমন বুঝছে তাঁর দল। তেমন বুঝছেন রাজ্যবাসী।

তাই ভাবছি কী এমন হলো যে তাঁর কুইন মাদারের হাত ছাড়লেন মমতা। ভুলে গেলেন গুরু সন্তানের প্রতি তাঁর স্নেহ? কিছুদিন আগেও মমতার 'গুড বুকে' ছিলেন না শিল্পপতি গৌতম আদানি। বিরোধীরা সংসদে লালকৃষ্ণ আদবানীকে ঠাট্টা করে বলতেন আপনার নাম থেকে 'ব' শব্দটি বাদ দিয়ে দিন। নরেন্দ্র মোদী আপনার কথা মন দিয়ে শুনবেন। মমতার দল সেই ঠাট্টাতে হাততালি দিত।

এখন দেশের সবচেয়ে বিত্তশালী শিল্পপতি গৌতম আদানি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে রাজ্যে লগ্নি করাতে মমতা যেমন আগ্রহী তেমনই আগ্রহী তাঁর 'পরম শত্রু' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দিয়ে কলকাতায় বিশ্ব শিল্প সম্মেলন উদ্বোধন করাতে। টাটাদের আটকে দিয়েছিলেন মমতা। সে ব্যথা রাজ্যের সর্বাঙ্গে।

ঘোষিত অপছন্দের ব্যক্তি ও শত্রুদের কাছে টেনে নিয়ে কী বার্তা দিতে চাইছেন মমতা। কোন রাজনৈতিক অঙ্ক কষছেন তিনি। আমি বহুবার বলেছি মমতা অত্যন্ত 'চতুর' রাজনীতিক। নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করেন না।

'চতুর' কথাটি অনেকে 'অনৈতিক' বা খারাপ অর্থে ব্যবহার করেন। আমি তা করি না। আমি 'চতুর' বলতে মমতাকে 'কুশলী' হিসেবে বুঝি। যেমন প্রশান্ত কিশোর। ভোট কুশলী। মমতাও তেমনি রাজনৈতিক কুশলী। যখন যেমন তখন তেমন। যেখানে যেমন। সেখানে তেমন। চলতি বাংলায় একে বলে 'বরের ঘরের পিসি আর কনের ঘরের মাসি'। মমতা তাই।

একটি লাইনে কয়েকটি বক্তব্যকে ফেললে বোঝা যাবে কেন পালটাচ্ছেন মমতা? দেখে নেওয়া যাক, প্রশান্ত কিশোর— আগামী ৪০ বছর বিজেপি সত্য। এটা মেনে নিতে হবে—

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে থাকতে এসেছে। চলে যেতে নয় (২০২১ রাজ্য ভোটের আগে)।

মমতা— ইউপিএ ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। ওরা আর লড়ে না। অস্তিত্বহীন।

কিশোর— ১০ বছরের কংগ্রেসের শুধু ক্ষয় হয়েছে, কারণ এর মধ্যে তারা ৯০ শতাংশ নির্বাচন হেরে গিয়েছে।

দিলীপ ঘোষ (বিজেপি)— মমতাই এখন মুখ। সোনিয়া নয়। কংগ্রেসের দিন শেষ।

কিশোর— (কংগ্রেস রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে)— বেশিরভাগ সময় দেশের বাইরে থেকে কীভাবে কারো নেতৃত্ব করার ঐশ্বরিক অধিকার জন্মায়?

মমতা— দিল্লি এলেই সোনিয়াজীর সঙ্গে দেখা করতে হবে নাকি?

মমতার এই পালটে যাওয়া থেকে এটা পরিষ্কার এ মমতা সে মমতা নয়। নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন কংগ্রেস মুক্ত ভারত। আপাতত মমতা সেই স্বপ্নের শরিক বলেই আমার ধারণা। তাই ইতিহাস মুছে ফেলে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা মমতা। এটা সত্য ইউপিএ-তে কটা শরিক দল আছে বা কাজ করে তা অনেক কংগ্রেস নেতাই জানেন না। এনডিএ-রও তাই। সবই বিজেপি নির্ভর। নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ।

তবে মমতা সে ইতিহাস মুছতে পারবেন। তিনি ২ বছরের (২০০৯-২০১১) জন্য ইউপিএ-র শরিক রেলমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৯১-১৯৯৩ কংগ্রেস তাঁকে প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করেছিল।

মমতা তৃণমূলের গদ্দারদের ঘরে ফেরাচ্ছেন আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিজেই 'গদ্দারি' করছেন? রাজনীতিতে তা কীভাবে সম্ভব। সেটাই দেখার। নাকি অজানা কোনও 'খেলা আছে'।

মনে পড়ছে ২০১২ সালে রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে শেষ মুহূর্তে মমতার সমর্থনের ঘটনা। সোনিয়ার ফোন। মমতা ঘুরে গেলেন। 'না' এক মুহূর্তে 'হ্যাঁ' হয়ে গেল। হেরে গেলেন সাংমা। জয়ী প্রণব। শেষ হাসি হাসলেন মমতা। বামেরা তার চাতুরিতে কাত। বাম তৃণমূল ভোট দিল প্রণবকে। □

গরিব দিদি, ধনী বউদি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মাননীয় দিদি,

এমনটা যে হবে তা কি আপনি জানতেন। নিশ্চয়ই জানতেন। তবে আপনি পাত্তা দেননি। দেবেনই বা কেন! আপনি বিশাল সমর্থন নিয়ে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী। আর আপনি গরিব বলে আপনার বাড়িতে কেউ ধনী হবে না তার তো কোনও মানে নেই। আপনার ভাইপোর তো বিশাল বাড়ি, গাড়ি। সব কিছুই ধনীদের মতো। অথচ ভাইপো অভিষেক বাবাজীবনের কিছুই নেই। বাড়ি, গাড়ি কিছুই নেই বলে গত লোকসভা নির্বাচনে ভোটে দাঁড়ানোর সময়ে তিনি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছিলেন। দিদি, ভাইপোর সেই হলফনামাটা একবার দেখবেন প্লিজ। একটা ভুল আছে। আমার চোখে পড়েছে কিন্তু নির্বাচন কমিশন কেন সেটা দেখেনি কে জানে। অভিষেক ভাইপোর নিজস্ব বাড়ি গাড়ি না থাকলেও তিনি ভাড়াবাবদ রোজগার করেন। সেখানে আবার সোনাবৌমার অনেক টাকা দেখানো আছে।

কিন্তু দিদি এবারে তো একেবারে হাটে হাড়ি ভেঙে গেল। আপনার টালির চালা বাড়িতেই যে একজন কোটিপতি থাকেন সেটাও যে সবাই জেনে গেল। তিনি আপনার ভ্রাতৃবধূ। স্নেহের ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী কাজরী। পুরভোটে প্রার্থী। সেই প্রার্থী সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্যও কৌতূহলের কেন্দ্রে। কলকাতা পুরসভার ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির আর্থিক পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৯৯ টাকা। কাজরীর দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮৮৩ টাকা। আর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ১ কোটি ৪১ লক্ষ ২৬ হাজার ১১৬ টাকা। আর কার্তিকের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৯৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। এই হিসেবে কাজরী কমিশনকে জানিয়েছেন, কালীঘাট সংলগ্ন এলাকা, ওড়িশা ও বোলপুরে ৯টি জমি-জায়গা রয়েছে তাঁর।

টালির ঘরের বাসিন্দা হলেও আদতে তিনি কোটিপতি। সরি, কোটি কোটি পতি। তবে তিনি কিন্তু রোজগেরে নন। কাজরী দেবী গৃহবধূ। আর গৃহবধূ হয়েও এটা আমাদের গর্ব যে তিনি একজন মুখ্যমন্ত্রীর থেকেও বেশি সম্পত্তির মালিক। দিদি, আপনার বাড়ির সদস্যা গৃহবধূর এই বিপুল সম্পত্তি দেখে যাঁরা হিংসে করছে তাঁদের দেখিয়ে দিন যে বাংলা কত এগিয়ে। বাংলার একজন গৃহবধূও কত কোটির মালিক হতে পারেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের লাইনে দাঁড়ানো বধূর সংখ্যা রাজ্যে বেশি হলেও কোটিপতি গৃহবধূ নেই এমনটা বলা যাবে না।

তবে দিদি একটা প্রশ্ন আমার মনে আসছে। আমি যতটা জানি কার্তিকদা মানে আপনার ভাই তো বড়ো কোনও চাকরিবাকরি করেন না। ব্যবসাও নেই। যতদূর জানি উনি নিজেকে সমাজসেবী হিসেবে পরিচয় দেন। আর আপনার দলের নেতা হিসেবেও নাম রয়েছে। কী একটা জয়হিন্দ বাহিনী আছে তার মাথায় কার্তিককে আপনি বসিয়েছেন। দিদি, সেই একবার বাড়িতে ভাই ও ভাইবউদের অত্যাচারে আপনি মাকে নিয়ে তৃণমূল ভবনে গিয়ে উঠেছিলেন। সেই অত্যাচারীদের তালিকায় এই কাজরী বউদি ছিলেন। জানা নেই। তবে এটাও জানা নেই কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে এত কোটি টাকার সম্পত্তি বউদি কোথায় পেলেন তবে তো উত্তর দেওয়া যাবে না।

আমি তাই একটা কথা বলছি দিদি। ৭৩ নম্বর ওয়ার্ড আপনার নিজের পাড়া। সেখানে একদিন আগে এটা প্রচার করা হোক যে কেউ কাজরী বউদিকে কোনও প্রশ্ন করবেন না। শুধু ভোট দেবেন। আসলে তো প্রার্থী আপনিই। না, না তা বলে আপনিই কোটিপতি এটা বলছি না। □

With Best Compliments from :

A WELL WISHER

অতিথি কলম

চেতন ভগত

উন্নয়নের গাড়ির ব্রেক কষা আরও কমাতে হবে

ব্রেক ও গাড়ির গতি বাড়ানোর যন্ত্র দুটোই দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশের পক্ষে গাড়িতে তেল বা গ্যাস, যা হয় ভরে গাড়ি ছোটাতে হবে-- সেখানেই আত্মনির্ভরতা।

সকলেই জানেন, চলতি মহামারীর দাপটে মানুষের জীবন নষ্ট হওয়া আটকানোই ছিল মানবতার প্রথম লক্ষ্য। বিশ্ব জুড়ে এর একটিই পথ ছিল টিকাকরণ। কিন্তু বাস্তবে ধনী দেশগুলির গালভরা বাণী 'যতক্ষণ না প্রত্যেকে নিরাপদ হচ্ছেন কেউই নিরাপদ নন' এটি স্তোকবাক্যই রয়ে গেল। এই বাণী উদ্গীরণকারীরা টিকা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল। এরপর তারা টিকার দাম নির্ধারণ নিয়ে উৎপাদনকারীদের খোলা ছুট দিল যাতে তারা বিপুল লাভ-সহ এমন দাম নির্ধারণ করে যা অন্য তুলনামূলক গরিবদেশগুলির ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে।

এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল আফ্রিকার বটসোয়ানার ক্ষেত্রে। এখানেই সাম্প্রতিক 'ওমিক্রন' প্রজাতির প্রথম সন্ধান মিলেছে। এই দেশ আগস্ট মাসেই Moderna টিকার জন্য ৫ লক্ষ ডোজের বরাত দেয় মার্কিন pfizer কোম্পানিকে। যার দাম তখনকার হিসেবে ২৯ ডলার অর্থাৎ ২২০০ টাকার মতো প্রতি টিকা। আজকের তারিখে বটসোয়ানার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও টিকাকরণ হয়নি। অন্যদিকে ধনী দেশগুলি তাদের নাগরিকদের প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়ার পর বুস্টার ডোজ দিয়ে চলেছে। অথচ বিশ্বের বিশেষ করে আফ্রিকান অঞ্চলগুলি আদৌ কোনো টিকা পায়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই যেন তেন প্রকারেণ আত্মনির্ভরতা আর কিছু না হোক জাতির জীবনদানের ক্ষেত্রে একমাত্র পথ। শত বাধা সত্ত্বেও ভারতের মতো বিশাল দেশ কিন্তু বিপুল অর্থবান না হয়েও এই দুঃসাধ্য কাজটি করে দেখিয়েছে। এগিয়ে চলেছে দেশের কর্মকাণ্ড আরও বহুবিধ 'আত্মনির্ভরতার' ক্ষেত্রে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই কিছু কায়েমি স্বার্থান্বেষী মানুষের ঢিলেমির ফলে কাজের গতি রুদ্ধ হচ্ছে। তবুও অর্থনীতির প্রগতি করোনার উপায়হীন শ্লথতাকে ঝেড়ে ফেলে এক ঝোড়ো গতি পেয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে বিপুল উদ্যমে মানুষ বৃদ্ধির চাকাকে টানছে। নাগরিকরা খরচ করছে, ভ্রমণে বেরোচ্ছে, এতদিন নানা আশঙ্কা ও অর্থকষ্টে তারা যা কিনতে পারেনি তা কিনছে। যে যে আকাঙ্ক্ষা থেকে তারা গত দু'বছর বঞ্চিত থেকেছিল এখন তা মন ভরে পূরণ করছে। ভারতের তীর্থক্ষেত্র, ভ্রমণপিপাসুদের প্রিয় স্থানগুলি এখন কানায় কানায় পূর্ণ। বড়ো বড়ো শপিং মলগুলির মালিকদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি সেখানে গমনাগমন কোভিড পূর্ব লেনদেনকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।

সপ্তাহের বেশ কিছু কিছু দিনে উড়ান সংস্থাগুলির বিক্রি মহামারীর পূর্ববর্তী সময়ের পরিমাণকে টপকে যাচ্ছে। এটি দেশের সর্ববৃহৎ উড়ান সংস্থার বক্তব্য। জিএসটি বাবদ কর আদায়ে বিপুল বৃদ্ধি রেকর্ড ছুঁয়েছে। গত দেড় বছর ধরে শেয়ার বাজারের ঊর্ধ্বগতি বহু সাহসী সঞ্চয়ী মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ এনে দিচ্ছে। লেনদেনে বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছে। এখানে প্রতিটি লেনদেনে কিন্তু জিএসটি দেওয়া বাধ্যতামূলক হওয়ায় সরকারের কোষাগারে অর্থাগম হচ্ছে। শেয়ার মার্কেট মানে আর অচ্ছুত জুয়া নয়। ওমিক্রনের হাওয়ায় সাম্প্রতিকভাবে কিছুটা পতন এসেছে। আশা করা যায় তা শেয়ার বাজারের রুটিন প্রক্রিয়া।

এছাড়া অর্থনীতিবিদদের মতে আরও বহু ক্ষেত্রেই ইতিবাচক সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে দেশের Gross Domestic Product (GDP) জুলাই-সেপ্টেম্বর '২১ ত্রৈমাসিকে কোভিড পূর্ববর্তী পরিসংখ্যানকে ছাপিয়ে গেছে ৮.৪ শতাংশের সীমা ছুঁয়ে।

খবরগুলি ইতিবাচক কিন্তু আমাদের এই গতিকে অব্যাহত রাখতে হবে যদি ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতির স্বপ্ন সফল করতে হয়। এক্ষেত্রে পরবর্তী ৫ বছরে আমাদের নাগাড়ে ৯ শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধি ঘটিয়ে যেতে হবে। এর ফলে বছরে নাগরিক প্রতি আয় হবে ৩৩০০ ডলার। একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতির পক্ষে এটি দৃঢ় ভিত্তিভূমি। এই বৃদ্ধি চালু রাখতে পারলে আমাদের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্যক্ষেত্র ও শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে। এই লক্ষ্য পূরণে আমার আটটি পরামর্শ আছে।

(১) কর ব্যবস্থার সংস্কার থেকে উন্নয়ন পন্থার সংস্কার করতে হবে। সরকার এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বড়োসড়ো নীতিগত পদক্ষেপ নিয়েছে। আমি একটু যান্ত্রিক দিক থেকে বলি অর্থনীতি এখন এগিয়ে চলেছে। অর্থনীতিকে একটি গাড়ি ধরলে এখন কি বেশি ব্রেক করা উচিত? কেননা কর ব্যবস্থা কিছুটা ব্রেকেরই কাজ করে। তার জায়গায় ধাবমান অর্থনীতির

acceletor-এই এমন পা রাখতে হবে যাতে গাড়ি আরও স্পিড পায়। জোরে ছোটে।

(২) ISAR–Indian spceial administrative Reforms— কেন বুদ্ধিমান কারিগরি শিক্ষায় খুরধার মস্তিস্কের মানুষ, সফল ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারীরা দুবাই, হংকং, সিঙ্গাপুর ছুটবে? এই ছোটো ছোটো city state-গুলিতে (যেমন আমাদের দিল্লি) করের হার কম, পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ও উপযুক্ত কর্পোরেট আইন রয়েছে। আমরা কেন এই রকম সংহত শহর তৈরি করতে পারব না (যেটি গুজরাটের থেকেও আরও বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে)? দু' তিনটি এমন শহর কেন তৈরি করব না যেখানে উল্লেখিত আইএসএআর অনুমোদিত বন্দর থাকবে এবং নিয়মকানুনেও কিছু পরিবর্তন পরিমার্জন হবে। আমি নিশ্চিত এটা করতে পারলে শুধু এই আইএসএআর শহর থেকে আগামী ৫ বছরে জিডিপি-তে ১ ট্রিলিয়ন বৃদ্ধি ঘটবে। একসঙ্গে যেহেতু আমরা গোটা দেশের শহরগুলিকে এই মাত্রায় তুলতে পারব না, কয়েকটি অনায়াসে করা যায়।

(৩) চীন নির্ধারিত বা তাদের অনুসৃত প্যাকেজ দরকার নেই। যে কোনো কারণেই হোক চীন এখনও কোভিড শূন্য করতে সমস্ত সীমান্ত বন্ধ রেখেছে বিভিন্ন অঞ্চলে কড়া লকডাউন জারি আছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নিত হয়েছে। ভারতের কাছে এটি সুবর্ণ সুযোগ সারা বিশ্বের লগ্নীকারীদের যেন তেন প্রকারেণ ভারতে টেনে আনার। এখানেই তাদের উৎপাদন শুরু হোক যেটা তারা চীনে করত। করছাড়া, কমদামে জমি ও নিকটবর্তী বন্দর তাদের গুছিয়ে দেখাতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে। আজ নয় কাল চীন নিশ্চয় খুলবে কিন্তু তাঁর আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ভারতে বসানো দরকার।

(৪) আইনগত ব্যবস্থা— সারা বিশ্ব এটা জানে এবং মানে যে ভারতে একটি পরিচ্ছন্ন আইন ব্যবস্থা বলবৎ আছে। একটাই শুধু খারাপ দিক সেটা হলো দেশের আইন ব্যবস্থাটি বড়োই ধীরে চলে। ফয়সালা হতে বহু দেরি হয়। প্রযুক্তির উন্নতি দেশের বহু ক্ষেত্রেই দ্রুততা এনেছে আইনি ক্ষেত্রেও তার আরও বেশি প্রয়োগ দরকার যাতে তা আরও দুরস্ত হতে পারে। ইতিমধ্যেই আমরা আইনি কাগজপত্র কম্পিউটারে ঢোকানো শুরু করেছি virtual hearing-ও যথেষ্ট বেড়েছে তবুও এখানে ব্যাপক শ্লথতা ও আইনি দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে যার পরিবর্তন জরুরি।

(৫) জিএসটি-কে আরও যুক্তিগ্রাহ্য করা— সারা বিশ্বে জিএসটি চালু থাকার নিয়ম হচ্ছে একই ধরনের পণ্য ও সার্ভিসের ওপর সমস্ত ক্ষেত্রেই একই কর চালু থাকা। আমাদের এখানে উন্নতি হলেও এখনও বহু ধাপ ও নানা ধরনের পৃথকীকরণ চালু আছে। অত্যন্ত দ্রুত এর সংস্কার করা দরকার।

(৬) মুদ্রাব্যবস্থার উদারীকরণ— হয়তো ১৯৯০ সালে আন্তর্জার্তিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের যে ভয়ংকর balance of payment সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেই ভয়েই হয়তো আমরা টাকাকে বাজারের সঙ্গে fully convertible করতে পারিনি। যদিও ভারতীয় টাকার মূল্য এখন বহু পরিমাণে আন্তর্জাতিক খোলা বাজারের সঙ্গে লেনদেনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হচ্ছে। তবু এখনও বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন জারি আছে যার ফলে পুরোপুরি এবং সহজভাবে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। এখানে ব্যবস্থা নিতে হবে অর্থমন্ত্রক ও আরবিআই-কে।

(৭) ভ্রমণ ও আতিথেয়তা ক্ষেত্রে প্যাকেজিং— বিগত দু'বছর এই ক্ষেত্রটি ভয়াবহ মন্দার মুখে পড়েছে। মানে নিশ্চিতভাবে সরকারকে এদিকে নজর দিতে হবে। প্রয়োজনে ভরতুকি দিতে হবে যাতে এই ক্ষেত্রটি পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারে। মনে রাখতে হবে এটি বিপুল পরিমাণ চাকরি তৈরি করার সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র।

(৮) বিশ্বের সফল ব্যবসায়ী উদ্যোগ ও এনআরআইদের কর ছাড়— বহু বড়ো বড়ো পুঁজিপতি তাঁদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হিসেবে ভারতের বদলে অন্য দেশকে বেছে নিয়েছেন। ভারতে থাকলে তাদের এক জটিল হারে কর দিতে হবে। আমরা কি তাদের এখানে চাইব না? কেন বিশ্বের অন্য দেশগুলি তাদের পুঁজি ও কুশলতা একচেটিয়া ভোগ করবে? যেখানে তাদের এখানে ফেরানোর সুযোগ রয়েছে। তাদের হাজার হাজার কোটি এখানে বিনিয়োগ হলে চাকরিও তৈরি হবে, দেশও হয়ে উঠবে 'আত্মনির্ভর'। আমাদের হিসেব করতে হবে আমরা কত পরিমাণ অর্থ বিশ্ব করনীতির আওতায় এই এনআরআইদের কাছে পাচ্ছি আর কতটাই বা আমাদের এখানে তাদের বসাতে পারলে পাওয়া যাবে।

ব্রেক ও গাড়ির গতি বাড়ানোর যন্ত্র দুটোই দীর্ঘমেয়াদি হিসেবে একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশের পক্ষে গাড়িতে তেল বা গ্যাস, যা হয় ভরে গাড়ি ছোটাতে হবে-- সেখানেই আত্মনির্ভরতা।

(লেখক বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক পর্যালোচক)

শোকসংবাদ

স্বস্তিকা পত্রিকার দীর্ঘদিনের কাগজ সরবরাহকারী উত্তর কলকাতার নলিন সরকার স্টিটের বাসিন্দা কমল পাত্রের কনিষ্ঠ পুত্র দিবেন্দু পাত্র গত ৩১ অক্টোবর মাত্র ২৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। কয়েকদিনের জ্বরে মাল্টি অরগ্যান ফেলিওর তাঁর মৃত্যুর কারণ। উল্লেখ্য, উত্তর কলকাতার তরুণ পুজো উদ্যোক্তাদের তিনি অন্যতম। পুজোমহলে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। দক্ষিণ কলকাতার পুজোতেও তাঁর প্রভাব ছিল। চার বছর আগে তাঁর প্রচেষ্টাতেই শহরের ভালো পুজোর জন্য 'বঙ্গশ্রী সম্মান' পুরস্কার শুরু হয়। পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে তিনি 'জাম্বো' নামে পরিচিত ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর জেলা কার্যবাহ সমীরণ গোস্বামীর বড়দাদা প্রদীপ গোস্বামী গত ৩ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৪ ভাই ও ২ বোন রেখে গেছেন। তাঁর শেষকৃত্যে সহক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাতো ও প্রান্ত সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

ভোট-সন্ত্রাস বন্ধে আদৌ আন্তরিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ?

কলকাতার পুর-নির্বাচন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড-ইন- কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে এবার পুরভোটে যাবে তাঁর দল। অর্থাৎ ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটের সেই ভয়াবহ স্মৃতি এবার রাজ্যবাসীর কাছে আর ফিরবে না বলেই তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। এমনকী দলীয় কর্মীদের তিনি হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন, কোথাও কর্মীরা গুন্ডামি করলে দল তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। প্রয়োজনে দল থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হতে পারে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ভাষায় 'ভূতের মুখে রামনাম' শুনে পশ্চিমবঙ্গবাসী তাজ্জব বনে গিয়েছেন। ২০১৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন তো অনেক আগের ঘটনা, অতি সাম্প্রতিক বিধানসভা উপনির্বাচনেও দিনহাটা, গোসাবা ও খড়দহে আর কিছুটা শান্তিপুরে শান্তিতে ভোট হয়েছে বটে, তবে সেটা শ্মশানের শান্তিতে, যার দরুন তৃণমূলের প্রায় ৮৭-৮৮ শতাংশ ভোট প্রাপ্তি। অতীতের বাম রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গিয়েছে তা। এই স্মৃতি রাজ্যবাসীর মনে এখনও টাটকা। সুতরাং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শান্তির বাণী শুনে রাজ্যবাসীর মনে হতেই পারে 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইতেছে ব্যর্থ পরিহাস'। এখানে আরেকটা প্রাসঙ্গিক কথাও পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর ভাইপোকে দিল্লি থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নামিয়ে দেন। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব বহুল প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও 'তৃণমূল যুবা' নামে আরেকটা সংগঠন গড়ে তার মাথায় নিজের ভাইপো অভিষেককে বসিয়ে দেন। তারপর ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে অভিষেককে তিনি সোমেন মিত্রের জেতা আসন ডায়মন্ডহারবার থেকে দাঁড় করিয়ে জিতিয়ে আনেন। এইভাবে অনেকটা 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভূমিকায় তাঁর রাজনীতিতে পদার্পণ। তখন থেকেই তৃণমূলের বুদ্ধিমানেরা বুঝে যান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর ভাইপোকেই নির্বাচন করেছেন। কংগ্রেসি মমতা ঠিক কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রকেই যে অনুসরণ করছেন, এটা রাজ্যবাসীরও বুঝতে বাকি ছিল না। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের ভোট সন্ত্রাস যে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের মদতেই সংঘটিত হয়েছিল, এই অভিযোগ বিভিন্ন বিরোধীরা একাধিকবার করেছেন। এমনকী কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় তৃণমূল ছাড়ার পর দলের ২০১৮-য় ভোট সন্ত্রাসকেই দায়ী করেছিলেন। এমনকী ২০১৫ সালের কলকাতার পুরনির্বাচনে যে ভয়াবহ সন্ত্রাস হয়েছিল, তাও তৃণমূলের সেকেন্ড- ইন-কমান্ডের নকশা বলে অনেকে মনে করেন।

এই যাঁর অতীতের কর্মকাণ্ড তাঁর মুখেই যখন শান্তির ললিত বাণী শোনা যায়, তখন ঘরপোড়া গোরু রাজ্যবাসীর তা ব্যর্থ পরিহাস বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। ছয়ের দশকের শেষে যুক্তফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সিপিআইএমের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গের ভোট রাজনীতিতে সন্ত্রাসের আমদানি হয়। ভোটে গণ্ডগোল, ছোটোখাটো মারামারি, অশান্তি, এমনকী গুন্ডাগিরিও চলতো সেই স্বাধীনতার আগের আমল থেকেই। কিন্তু তাকে সঙ্ঘবদ্ধ ও ব্যাপক রূপ দেওয়ার কৃতিত্ব সিপিআইএমের, যুক্তফ্রন্টের আমলে। তারপর সাতের দশকের উত্তাল সময় কংগ্রেসের জমানায় ভোট সন্ত্রাসের আরেক রূপ দেখেছে পশ্চিমবঙ্গবাসী। বিশেষ করে ১৯৭২-এ। '৭৭-এ ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট সরকার ভোট সন্ত্রাসকে শিল্পের পর্যায় নিয়ে গিয়েছিল। তাদের নীরব ভোট সন্ত্রাস, ছাপ্পা, যাকে শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত বৈজ্ঞানিক রিগিং আখ্যা দিয়েছিলেন, শ্মশানের শান্তিতে ভোট-পরিচালনা করা এসবের প্রচলনকারী হিসেবে বামফ্রন্টের চৌত্রিশ বছরের শাসন কুখ্যাত হয়ে থাকবে। এই সন্ত্রাসের ভয়াবহ চিত্র ধরা আছে আরেক সাংবাদিক পি নাম্বুদ্রিরির 'বেঙ্গল নাইটস উইদাউট এন্ড' গ্রন্থে। লোকে এই কুখ্যাত শাসন, এই নির্বাচনী সন্ত্রাসের অবসান চেয়ে এবং মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষ নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন উজাড় করে দিয়েছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে সেই নির্বাচনী সন্ত্রাস, রাজনৈতিক গুন্ডাবাজি থেকে রাজ্যবাসী মুক্ত হতে পারেনি। কারণ শাসকের মাথাটাই বদলেছে। নীচের তলায় কোনো মৌলিক বদল হয়নি। তাই বদলা নয় বদল চাই, কেবল রাজনৈতিক লোক দেখানো স্লোগানই থেকে গিয়েছে।

> **১৫-২০ বছর আগে বিহারের যে ভোটে ভাবমূর্তি ছিল আজ পশ্চিমবঙ্গের ঠিক সেই ভাবমূর্তি। আর এই ভাবমূর্তি নিয়ে তাঁর পিসির যে সারা দেশের সামনে সর্বজনমান্য বিরোধী-নেত্রী হওয়া খুব মুশকিল, এটুকু বোঝার ক্ষমতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলক্ষণ আছে।**

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মনে যাই থাক, অভিষেক মুখে এই কথাগুলো বলেছেন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে। খুব সম্ভবত, সর্বভারতীয় স্তরে তৃণমূলের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গের ভাবমূর্তি ফেরাতেই তাঁর এহেন বক্তব্য। কারণ ১৫-২০ বছর আগে বিহারের যে ভোটে ভাবমূর্তি ছিল আজ পশ্চিমবঙ্গের ঠিক সেই ভাবমূর্তি। আর এই ভাবমূর্তি নিয়ে তাঁর পিসির যে সারা দেশের সামনে সর্বজনমান্য বিরোধী-নেত্রী হওয়া খুব মুশকিল, এটুকু বোঝার ক্ষমতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিলক্ষণ আছে। যে ভোট-সন্ত্রাস স্থানীয় ভোটে তৃণমূলের মূল চালিকা-শক্তি, নীচুতলার 'দুষ্কৃতী-কর্মী'দের ওপর তাদের যে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তা মমতা-অভিষেক উভয়েই ভালোই জানেন।

তাই হুমকি-হুঁশিয়ারিটুকুই সার। এটা তাঁরাও জানেন, কিন্তু বিরোধী-রাজনীতির চালিকাশক্তি হওয়ার বাসনায় তাঁরা এতই মশগুল যে তৃণমূলি-প্রথাবিরুদ্ধ কথা বলে ফেলেছেন। সত্যি যদি তা-ই হয়, তবে রাজ্যবাসী নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হবেন, কিন্তু একইসঙ্গে তৃণমূলের রাজনৈতিক অস্তিত্বও বিপন্ন হবে। □

দেশ ও জাতির সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা ক্ষমার অযোগ্য

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

শুরুতে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। আমাদের জাতীয় সংগীত নিয়ে কোনো আপত্তি তো দূরের কথা আমরা তার জন্য গর্বিত। কিন্তু আদিতে তো বন্দে মাতরম জাতীয় সংগীত হওয়ার কথা ছিল। তা কাদের স্বার্থে ও বাধায় হলো না? বিক্রমাব্দ চালু হয়েও তা হলো না কেন? এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব আমরা।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রসিদ্ধ সংগীতকার পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরকে অনুরোধ করেন এদিন মধ্য রাতে সংসদে বন্দে মাতরম গাইতে হবে। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ রাজি হলেন একটা শর্তে। পুরো বন্দে মাতরম ২২ পঙ্‌ক্তি ৯ মিনিট ব্যাপী গাইতে দিতে হবে। প্যাটেল রাজি। তিনি গাইলেন সেই মধ্য রাতে। তার পরে মুসলমানরা আপত্তি করল— না, ওতে দুর্গার কথা আছে, চলবে না। নেহরুর নির্দেশে এক কমিটি গঠিত হলো। কে তার প্রধান? মক্কায় জন্ম, প্রথাগত শিক্ষাবিহীন (কিছু ইসলামি শাস্ত্রে চর্চা করেছিলেন), পরে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ! সেই কমিটির ফতোয়ায় মূল বন্দে মাতরমের শুধু প্রথম স্তবক জাতীয় গীত বা ন্যাশনাল সং হিসেবে গৃহীত হলো। খণ্ডিত ভারতবর্ষে মুসলমানদের কথায় বন্দে মাতরমের অঙ্গচ্ছেদ করা হলো! আবুল কালাম আজাদের পূর্বপুরুষ হেরাত থেকে এসেছিলেন। তাঁর প্রথম নাম ছিল ফিরোজ বাহাদুর। তারপর নাম হয়েছিল মৈনুদ্দিন। ভারতে তাঁর নাম হলো আবুল কালাম। তারপর এক বিশেষ রাজনীতির কারণে তাঁর নাম হয়ে গেল মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তিনি এক বই লিখেছিলেন, বলেছিলেন, 'আমার এই বইয়ের ৩০ পৃষ্ঠা আমার জীবিতকালে ছাপানো যাবে না'।

তাঁকে এপিটোম অব সেক্যুলারিজম বলা হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে ওরিয়েন্টাল ব্ল্যাকসোয়ান পাবলিকেশনস সুপ্রিম কোর্টে কেসে জিতে সেই ৩০ পৃষ্ঠা ছাপে। ১৯৯৮-তে ওই বই বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। তিনি লিখেছিলেন জিন্না ঠিক, নেহরু ভুল। জিন্না সব মুসলমানকে পাকিস্তানে যেতে বলেছিলেন আর নেহরু না করেছিলেন! যখন ১৯৯২ সালে রামজন্মভূমি-বাবরি ধাঁচা অপসারিত হলো তখন আওয়াজ উঠল সেক্যুলারিজম বিপন্ন। সেই সময়ই মৌলানা আজাদকে ভারত রত্ন দেওয়া হলো। ১৯৫৮ সালে তিনি মারা যান, ১৯৯২-তে তাঁকে ভারত রত্ন দেওয়ার কী প্রাসঙ্গিকতা? কারণ কংগ্রেসে থেকে তিনি এমন শিক্ষানীতি তৈরি করেছিলেন যাতে ভবিষ্যতে জিন্নার মতো ডাইরেক্ট অ্যাকশন করা যাবে। ৭০ বছর বাদে আজ দিল্লির রাস্তায় যে আন্দোলন হয়েছে সিএএ-র বিরুদ্ধে তা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের থেকে একটুও আলাদা নয়। তাই মৌলানা আজাদ শিক্ষামন্ত্রী হয়ে নুরুল হাসান, ইরফান হাবিবদের হাতে ইতিহাস তৈরির ভার দিয়েছিলেন। আজ ২০২১ সালের অবস্থান ১৯৪৬-এর মতোই ভয়াবহ! বন্দে মাতরম খণ্ডিত করা তার প্রথম ঝলক মাত্র।

নেহরু ছিলেন নির্বাচিত একনায়ক। আমাদের ভুললে চলবে না হিটলারও নির্বাচিত একনায়ক ছিলেন। নেহরু বলেছিলেন আমি জন্মসূত্রে ইংরেজ, সংস্কৃতিতে মুসলমান আর দুর্ঘটনাবশত হিন্দু।

নন্দলাল বসুর আঁকা ২২টি ছবি সংবিধান থেকে কী করে গায়েব হয়ে গেল? এই ছবিতে ভারতের ইতিহাসের চিত্র ছিল। থটস অন পাকিস্তান গ্রন্থে আম্বেদকর বলেছিলেন, ভারতবর্ষ ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানরা ভাগ করে নিয়েছে। সুতরাং মুসলমানরা এদেশে থাকবে কেন? আম্বেদকরের এই কথা পড়ানো হয় না। কার অঙ্গুলিহেলনে? তাঁকে হিন্দু বিরোধী প্রতিপন্ন করার জন্য মুখিয়ে আছে স্বঘোষিত লিবারেল সেকুলারা।

১৯৫৭ সালে সংসদের দু' কক্ষে পাশ হয় যে দেশের জাতীয় ক্যালেন্ডার বিক্রম সংবৎ হবে। কিন্তু তা হলো না। বিক্রম সংবৎ ক্যালেন্ডার ছাপা হলো, তাতে বিক্রম সংবতের তারিখ ছোটো আর খ্রিস্টান তারিখ বড়ো করে দেখানো হলো। স্বাধীন ভারতে 'ইন্ডিয়া' কথাটা ১৯৪৭ সালে গৃহীত হয়েছে আর 'ভারত' নামটা আছে হাজার হাজার বছর আগে থেকে।

ফঃ ২

গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার চালু খ্রিস্টান ধর্মমতানুসারে। যারা সংসদে পাশ করিয়েছিলেন দেশে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার চলবে না তাঁরা (নেহরুর কমিটিতে নন্দলাল বসু ছিলেন) সেই সময়ে কী করছিলেন? কেন তা চালু হতে দিলেন না? সেই সময়ে নেহরুর থেকে অনেক উঁচু মাপের ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাঁরা এইসব ছোটোখাটো কথায় গুরুত্ব দিলেন না। এটাই আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির দোষ। খুব বড়ো মাপের বৌদ্ধিক নেতারা বহু গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে ছোটো মনে করে তাতে কথা বলেন না। তাঁদের মানের নীচে বলে। পরিতাপের বিষয়!

মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে চার প্রবীণ মানুষ ছয় বছর আগে (২০১৫) পেনসনের দু লক্ষ টাকায় শক সংবাদ ক্যালেন্ডার চালু করেছেন। ১ জুলাই ২০১৫ সালে আরবিআই এই ক্যালেন্ডারকে ২২ মার্চ, ১৯৫৭ সাল থেকে চালু ঘোষণা করেছে। সব ব্যাঙ্কে এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়। এই ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে চেক ড্র করলে তা মান্যতা দিতে বাধ্য ব্যাঙ্কগুলো। ভোডাফোন এই কারণে চেক বাতিল করলে তার ৫৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে উচ্চ ন্যায়ালয়। তারপর তারা মেনে নিয়েছে। এটা মহারাষ্ট্রের ঘটনা।

এটা একটা ক্যালেন্ডার নয়, আন্দোলন। দুনিয়া মানছে, গুগল মানছে কিন্তু ভারত সরকার মানছে না। রবিবার শনিবার ছুটি খ্রিস্টান ধর্ম অনুসারে, কেন হবে? কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের লোগো 'তমসো মা জ্যোতির্গময়ো' যার অর্থ অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চলো তার উপরে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে জেহাদি গোষ্ঠী!

প্রতিদিন পাঁচবার আজানে বলা হয় 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ভগবান নেই' একথা সেক্যুলার দেশে বলা হয় কী করে? সব ধর্ম বরাবর হলে একথা বলা যায় না। সব ধর্ম সমান হলে ধর্মান্তরণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ৭৬ সালে কেজিবির চাপে সেক্যুলার ও সোশ্যালিজম শব্দ জোড়া হয়। ভারতের সংসদে একশোর অধিক সদস্য তাদের বেতনভুক ছিল। কারণ রাশিয়ার সমর্থনের দরকার ছিল। সেক্যুলার শব্দের কোনো অর্থ ভারতীয় ভাষায় নেই। এতো মাফিয়া অপারেশন! দেশের মানুষ সাভারকর, সুভাষ বসুকে বীর মানে কিন্তু ছবি থাকে অন্য কারো।

আমাদের জাতীয় চেতনায় ন্যাশনাল ক্যালেন্ডার রয়েছে। আমরা আমাদের উৎসব, বিবাহ, শ্রাদ্ধশান্তি, শুভযাত্রা সব করি এই ক্যালেন্ডার অনুসারে। ১৯৫৭ সাল থেকে এই ক্যালেন্ডার চালু হওয়ার কথা, কোন চক্রে তা চালু হতে হতে হচ্ছে না?

নেহরু ছিলেন নির্বাচিত একনায়ক। আমাদের ভুললে চলবে না হিটলারও নির্বাচিত একনায়ক ছিলেন। নেহরু বলেছিলেন আমি জন্মসূত্রে ইংরেজ, সংস্কৃতিতে মুসলমান আর দুর্ঘটনাবশত হিন্দু। তিনি এই কাজই তো করবেন!

মাউন্টব্যাটেন তাঁর স্কুলের বন্ধু র‍্যাডক্লিফকে চিঠি লিখেছিলেন ভারতের বিভাজন রেখা তৈরি করতে হবে। ওয়াল্টার রীড তাঁর 'দি ব্রিটিশ বিট্রেয়াল অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, র‍্যাডক্লিফ সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেছিলেন এই কাজের জন্য কম করেও তিন বছর লাগবে। মাউন্টব্যাটেন বললেন না তিন মাসের বেশি দেওয়া যাবে না। নেহরু বললেন না এক মাসের বেশি দেওয়া যাবে না। শেষমেশ পঁয়ত্রিশ দিনে দিল্লিতে বসে এই বিভাজন রেখা তৈরি হলো। র‍্যাডক্লিফ বলেছিলেন, 'এতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে। ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না'। যখন এই কাজ চলছে তখন গান্ধী বয়ান দিলেন ভারতের দেশভাগ আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হবে। অথচ তিনি জানতেন না মাউন্টব্যাটেনদের কথা তা হতে পারে না। তিনি মানুষের নজর অন্যদিকে ঘোরাবার জন্য এই রকম বয়ান দিয়েছিলেন। এসব কথা কারও অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনা, সার্বিক চরম লক্ষ্য ছিল, ভারতীয়ত্ব থেকে ভারতবর্ষকে ছিন্ন করে তাকে আব্রাহামিক করতে হবে--- বোঝার জন্য এইসব প্রসঙ্গের অবতারণা করা দরকার আছে।

কার এত তাড়া ছিল? সুভাষচন্দ্রকে যুদ্ধাপরাধী, ভগৎ সিংহকে চরমপন্থী আজও বলা হয়, কেন? আমাদের টুকরো করে না বুঝে সমগ্র চালটাকে বুঝতে হবে। উত্তর ভারতে মুঘলিস্তান ও দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়ীস্তান করতে হবে, দাবি উঠছে। তাই খোলামেলা আবেদন উঠছে আমাদের জিন্নার মতো আজাদি চাই। তাই মৌলানা আজাদ জিন্নাহর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে যাঁরা মেরেছে তার মধ্যে রাশিয়ান ও পাকিস্তানের হাত ছিল। আর এদের অঙ্গুলিহেলনেই ১৯৭৬ সালে দেশকে সেকুলার করা হয়েছিল। এসব আজ প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। শয়তানদের মুখোশ খসে পড়ছে। তাই আজ অসহিষ্ণুতার চিৎকার উঠছে। আগামী প্রজন্ম এদের ক্ষমা করবে না। দেশ ও জাতির সঙ্গে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা ক্ষমার অযোগ্য।

ভ্রম সংশোধন

স্বস্তিকার গত ২৯ নভেম্বর সংখ্যায় ১১ পৃষ্ঠায় উত্তর সম্পাদকীয়তে সুদীপ নারায়ণ বসুর 'সংবিধানে জালিয়াতি ও কম্যুনাল ভায়োলেন্স বিল' নিবন্ধের শুরুতে রয়েছে সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী প্রথম এই বিলের প্রতিবাদ শুরু করেন ১৯১২ সালে। পড়তে হবে ২০১২ সালে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি জন্য দুঃখিত।

— স্বঃ সঃ

ত্রিপুরায় গেরুয়া ঝড় বিরোধীরা ধূলিসাৎ

রামানুজ গোস্বামী

ত্রিপুরা-পুরনির্বাচন বা পুরভোটের ফলাফল সম্প্রতি আরও একবার প্রমাণ করে দিল যে ত্রিপুরাবাসী (ত্রিপুরার শহর ও গ্রাম সব ক্ষেত্রেই) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেই আছে; তৃণমূল, সিপিএম বা কংগ্রেসের সঙ্গে নয়। বিজেপির এই বিপুল জয়জয়কারে গুঁড়িয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় প্রচারে যাওয়া বড়ো-মাঝারি-ছোটো অর্থাৎ সমস্ত মাপের নেতা ও নেত্রীর অহংকার। বলাই বাহুল্য যে, তৃণমূল নামে সর্বভারতীয় কিন্তু প্রকৃত পরিসংখ্যানে এই রাজ্যেই সীমাবদ্ধ দলের কথাই এখানে বলা হয়েছে। আসলে, ত্রিপুরাবাসীর বহুকাল সিপিএমের অপশাসনের অভিজ্ঞতা আছে। তাই গত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুলভাবে তারা জয়ী করেছে বিজেপিকে। তারপর থেকে ত্রিপুরায় শুরু হয়েছে উন্নয়নের যুগ। এই তো সেদিনও প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরাকে ঢেলে সাহায্য করেছেন। ত্রিপুরাবাসী তাই এই পুরনির্বাচনে বিজেপিকেই জয়যুক্ত করে সেই উন্নয়নের কর্মযজ্ঞেই শরিক হলেন। বস্তুত আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটা ছিল সেমিফাইনাল। এতে তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস, এককথায় বিরোধীদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি এটাই প্রমাণ করল যে, তারা অপ্রতিরোধ্য।

প্রকৃতপক্ষে, তৃণমূলের যে নিজস্ব একচ্ছত্র ভোটব্যাঙ্ক (মুসলমান ভোট) পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে সাহায্য করে, তা ত্রিপুরায় নেই। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল-শাসনে যে অবনতি তথা যে অধঃপতন ঘটেছে, তা আজ সারা ভারত তথা সারা পৃথিবী জানে। তাই, ত্রিপুরাবাসী প্রথম থেকেই সাবধান ছিল। পাশাপাশি, ত্রিপুরাতে চতুর্মুখী লড়াই হলেও যেহেতু ওই রাজ্যের বাঙ্গালি হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের একটা বড়ো

অংশের মতো সেকুলারবাদী (আসলে শেখবাদী) নয়, তাই তারা ভোট ভাগাভাগি না করে একচেটিয়া বিজেপিকেই ভোট দিয়েছে ও জয়যুক্ত করেছে। তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম ও কংগ্রেসের একটা বড়ো অংশের ভোট পেয়েছে। এই ঘটনা ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; সিপিএম ও কংগ্রেস বহু ক্ষেত্রেই তৃণমূলকে ভোট দিয়েছে যাতে বিজেপি পরাজিত হয়। বস্তুত, এটাই এই সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের চক্রান্ত বা কৌশল। বলাই বাহুল্য যে, এর ফলেই তৃণমূল ত্রিপুরায় খাতা খোলবার সুযোগ পেয়েছে।

একটা কথা এক্ষেত্রে বলা দরকার। তা হলো এই যে, তৃণমূলনেত্রীকে ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী তথা একজন সর্বভারতীয় নেত্রীরূপে দেখানোর যে প্রয়াস তৃণমূল করছে, তাতে তৃণমূল কাজে লাগিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলপন্থী মূলধারার প্রায় সকল টিভি চ্যানেল ও সংবাদপত্রকে। ত্রিপুরায় নানাবিধ সাজানো ঘটনা, বিক্ষোভ, তৃণমূলের প্রচারের ধারাবিবরণী পেশ বা প্রচার ইত্যাদি করাই ছিল এই সকল মিডিয়ার কাজ। এরা যে তৃণমূলের এই শোচনীয় পরাজয়ে একেবারেই মুষড়ে পড়েছে— তা তো বলাই বাহুল্য। আসলে, এটা বোঝা দরকার যে, সর্বত্র ভিক্ষাভাতার জনপ্রিয়তা নেই। ত্রিপুরাবাসী শিক্ষা চায়, শিল্প চায়, চাকরি চায়, কর্মসংস্থান চায়, ব্যবসা-বাণিজ্য চায়, উন্নত পরিকাঠামো চায়, চায় আর্থিক উন্নতি ও স্বনির্ভরতা এবং আত্মমর্যাদার স্বীকৃতি— যা বিপ্লব দেবের সরকার তাদের দিয়েছে। এরা পশ্চিমবঙ্গের পাশ্চাত্য ভাবনায় পরিচালিত, তথাকথিত উদারমনস্ক ও ভাতাপ্রিয় বা বলা ভালো ভিক্ষাপ্রিয় এবং অতি অবশ্যই সুরাপ্রেমী বাঙ্গালি হিন্দু নয়। তারা নিজেদের ভালো বোঝেন। তারা বৃহত্তর ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্বও বোঝে। তাই যে দল সিএএ, এনআরসি ইত্যাদির মতো দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপারে খোলাখুলি ভাবেই বিরোধিতা করে, সেই দলকে ত্রিপুরাবাসী ভোট দেয়নি। ফলাফল এটাই যে, এতরকম ভাবে আসর গরম করবার ও গুরুত্ব কুড়িয়ে সর্বভারতীয় হওয়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও পরিসংখ্যান বলছে যে— ত্রিপুরা পুরভোটে ৩৩৪ হলো মোট আসনসংখ্যা। তার মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ৩২৯ এবং তৃণমূল, বাম ও অন্যান্যরা মিলিয়ে মোটে ৫। অতএব বিস্তারিত ব্যাখ্যার কোনো দরকারই নেই। এই জয় জাতীয়তাবাদের জয়, এই জয় উন্নয়নের জয়, এই জয় শান্ত ও সংস্কৃতিপ্রেমী ত্রিপুরাকে অশান্ত করবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিজেপির জয়। সারা ভারতের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী মানুষের কাছে ত্রিপুরা তাই আজ রোল-মডেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বার্থান্বেষী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ভবিষ্যতে সারা দেশেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে— এটাই কাম্য। □

ইলা মিত্রের নাম বামপন্থীরাও মনে রাখেননি

মণীন্দ্রনাথ সাহা

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর একটি ধর্ষণের ঘটনায় শুধু এই উপমহাদেশই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশও আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। বাংলা সাহিত্যে একাধিক কালজয়ী কবিতা ও উপন্যাসও লেখা হয়েছিল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। প্রায় বিস্মৃত সেই ঘটনার নায়িকার নাম ইলা মিত্র।

বিবাহের পূর্বে ইলা মিত্রের পরিচয় ছিল ইলা সেন। বাঙ্গালি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পিতা নগেন্দ্রনাথ সেন ও মাতা মনোরমা সেনের সন্তান ইলা সেন। পিতা ছিলেন একজন সরকারি কর্মচারী। নগেন্দ্রনাথের আদি নিবাস ছিল তৎকালীন যশোহর জেলার ঝিনাইদহের বাগুটিয়া গ্রামে।

কলকাতার বেথুন স্কুল ও বেথুন কলেজের ছাত্রী ইলা পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলাতেও ছিলেন খুবই পারদর্শীণী। ১৯৩৫ ও ১৯৩৮ সালে তিন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে শ্রেষ্ঠ অ্যাথলিট হিসেবে নির্বাচিত হয়। তিনি বাস্কেটবল খেলাতেও দক্ষ ছিলেন। ১৯৪০ সালে জাপানে অলিম্পিক গেমসে যোগদানের জন্য তিনি মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য তা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

১৯৪৪ সালে তিনি মালদহের রামচন্দ্রপুরের এক জমিদারের পুত্র রামেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ইলা সেন ইলা মিত্র নামে কলকাতা থেকে সুদূর মালদহের রামচন্দ্রপুরে শ্বশুরবাড়িতে গৃহবধূ হয়ে চলে আসেন। কিন্তু এখানে এসেই শুরু হয় তাঁর আর এক জীবন। গ্রামবাঙ্গলার সাধারণ মানুষ, ভাগচাষি কৃষক, দরিদ্রদের দুর্দশা মোচনের সংগ্রামে সঙ্গী হয়ে ওঠেন তিনি। গড়ে তোলেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। ১৯৪৬-৪৭ সালে উভয় বাঙ্গলায় শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। গরিব ভাগচাষিরা ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ দাবি করে যে

আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাই তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত। দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে এই আন্দোলন খুবই জোরদার হয়ে উঠে। ১৯৪৬ সালের ২২ জুন অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার তথা আজকের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খাঁপুর গ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত তেভাগা আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়ে ২২ জনকে হত্যা করে।

যুগ যুগ ধরে অধিকার বঞ্চিত ও শোষিত সাঁওতাল, রাজবংশীরা এতে ব্যাপকভাবে যোগদান করে। ইলা মিত্র তাদের আন্দোলনে যোগ দেন। গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে কৃষকদের সংগঠিত করতে থাকেন এবং কৃষকদের মধ্যে 'রানিমা' হিসেবে পরিচিত লাভ করেন।

আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। জমিদার, জোতদার ও সরকার এই কৃষকদের আন্দোলন দমন করতে সশস্ত্র অভিযান শুরু করে। ১৯৫০ সালের ৭ জানুয়ারি ২০০০ সৈন্য নিয়ে সাঁওতাল গ্রামগুলি ঘিরে ফেলে শুরু হয় সংঘর্ষ। শতাধিক সাঁওতাল এই আক্রমণে প্রাণ হারান; নেতাদের সন্ধানে ধৃতদের ওপর চলে অত্যাচার। কিন্তু কেউ নাম বলে না। ইলা মিত্র অন্যতম প্রধান আসামি হিসেবে চিহ্নিত হন। তিনি আত্মগোপন করতে গিয়ে মাথার চুল কেটে ফেলেন, হাতের নোয়া ভেঙে, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেন। শাড়ির বদলে পরেন ধুতি। শতাধিক কৃষক হত্যার কোনও বিচার নেই। কিন্তু সংগঠকদের খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটছে পুলিশবাহিনী।

১৯৫০ সালের ৭ জানুয়ারি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে আসছেন তিনি সাঁওতাল রমণীর ছদ্মবেশে। কিন্তু রোহনপুর রেল স্টেশনে ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে। নিয়ে আসা হলো নাচোল পুলিশ স্টেশনে। তারপর টানা চারদিন অকথ্য নির্যাতন পুলিশের। বুটের আঘাত, নগ্ন করে প্রহার, খেতে না দেওয়া, ধর্ষণ, দুই পায়ের মধ্যে লাঠি রেখে চাপ দেওয়া, পায়ের গোড়ালিতে পেরেক পুঁতে দেওয়া, গোপনাঙ্গে গরম ডিম প্রবেশ করানো— বাদ গেল না কোনো কিছুই। তবু মুখ খুললেন না তিনি। সহ্য করলেন যাবতীয় পাশবিক অত্যাচার।

মুমূর্ষু অবস্থা ইলা মিত্রের। স্ট্রেচারে করে আদালতে নেওয়া হলে তিনি অগ্নিবর্ষী বয়ানে বলেছিলেন— 'অপরাধী লিগ সরকার।' অপরাধী নুরুল আমিন। অপরাধী তার পুলিশ। খুনি তারা, তারা ব্যাভিচারী। কোর্টে আজ তারাই আসামি।' তিনি নিঃসংকোচে একে একে বর্ণনা করেন তাঁর ওপর কী ধরনের অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ ও সরকার পক্ষ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। এই কাহিনিটা শুধু ভারত নয়, সীমান্ত পেরিয়ে চীন, সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলন চলাকালীন দেশভাগের পর পাকিস্তানে বিচারের নামে প্রহসনে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল থেকে স্থানান্তর করা হয় তাঁকে ঢাকা জেলে। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ১৯৫৪ সালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

১৯৫৭ সালে প্রাইভেটে এম.এ পাশ করে সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৬২থেকে ৭৭-এর মধ্যে তিনি চারবার মানিকতলা আসন থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর ৭৭ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। ইলা মিত্রের জীবন একজন ধর্ষিতা নারীর সংগ্রামের এক অনবদ্য উপাখ্যান। ▯

মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। স্বপ্ন কি আদৌ কোনোদিন বাস্তবের রূপ নেবে? নাকি অধরাই থেকে যাবে দিল্লির মসনদ? জাতীয় রাজনীতির হালে পানি পেতে অনেক নাটকই করবেন, কিন্তু নাটক করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না।

দিবাস্বপ্নের ঘোরে বেসামাল তৃণমূল সুপ্রিমো

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্যের শাসক দলের এখন একটাই উদ্দেশ্য, দেশের প্রধান বিরোধী দল হয়ে ওঠা। কেননা শাসক দলের মতে, দেশের গত কয়েক বছরে কংগ্রেসের ফল খারাপ হওয়া। আরও একটি বিষয় তৃণমূল সামনে আনছে, সেটা হলো গত কয়েকটি নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণ করে তারা দেখেছেন যে ৯০ শতাংশ আসনে কংগ্রেস মূলত ব্যর্থ হয়েছে। আর এই যে একটা শূন্যতা দেখা দিয়েছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূল জাতীয় স্তরের রাজনীতির অঙ্গনে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। একদিকে যেমন তাঁদের লক্ষ্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে চাপে রাখা, অন্যদিকে যেটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সেটা হলো দ্বিধাগ্রস্ত ও দিশাহীন কংগ্রেসের ঘর ভাঙিয়ে নিজেদের দল শক্তিশালী করে তোলা। রাজনৈতিক মহলের একটি সূত্র বলছে, তৃণমূলের প্রধান পরামর্শদাতা প্রশান্ত কিশোরের দেওয়া বুদ্ধিতেই নাকি রাজ্যের শাসক দল এই অভিযানে নেমেছে। আর তাঁদের নাকি এই অভিযানে যেতে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ও ত্রিপুরার পুরনির্বাচনে একটি আসন পাওয়া। অন্যদিকে গোয়া ও মেঘালয়ে সামান্য প্রভাব বিস্তার হয়েছে বলে দাবি করা। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। আর এতেই নাকি রাজ্যের শাসক দলের জাতীয় দল হয়ে ওঠার দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে গেছে বলে দাবি করছেন তারা। আদতে তারা যে এই দৌড়ে রাজ্যকে কতটা পিছিয়ে দিলেন, সেটা রাজ্যবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

এবার আসা যাক রাজনৈতিক কৌশলগত ভাবে রাজ্যের শাসক দলের এই দৌড় একেবারে শুরুতে কতটা ধাক্কা খেল। রাজ্যের শাসক দলের একটি অংশের বক্তব্য, দেশের কাছে নাকি এটা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত যে বিজেপিকে হারাবার ক্ষমতা নাকি আছে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যেই। এবার বাস্তবতায় আসা যাক। জাতীয় স্তরে এখনও রাজ্যের শাসক দল একটি আঞ্চলিক দল হিসেবেই স্বীকৃত। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে সারা দেশের রাজনৈতিক মহলে রাজ্যের তৃণমুল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির নাম জানা, সেদিকে লক্ষ্য দিলে একটি কথা বলতেই হয়, ইউপিএ ও পরবর্তী সময়ে এনডিএ-এর হাত ধরেই মমতার উত্থান। তা না হলে তাঁকে কে চিনত! একসময়ে রাজীব গান্ধীর কৃপা

পেয়েছেন, অন্য সময়ে সুবিধাভোগী হয়ে কৃপা নিয়েছেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর। এটা একেবারেই ব্যক্তিগত পরিচয়ে। তাঁর দলের পরিচয় সেই অর্থে পশ্চিমবঙ্গেই আটকে। এবার আসা যাক তিনি সারা দেশে নিজের সংগঠনকে কীভাবে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে ১২ জন সাংসদের সাসপেনসনের সময়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কার্যত একঘরে রাজ্যের শাসক দল। সমস্ত বিরোধীরা প্রায় এককাট্টা হলেও, সেখানে এর মধ্যেই ব্রাত্যের তালিকায় আসতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, তৃণমূল অনেকটা বামপন্থীদের ঢঙে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলিকে টার্গেট করে এগোতে চাইছে। এক্ষেত্রে হয়তো কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দলে কলকে না পেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। আবার উপহারস্বরূপ সাংসদ হয়েও গেলেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে দেশের সবকটি রাজ্যেই আছে আঞ্চলিক দলের প্রভাব। আর সেই প্রভাব ছেড়ে সেই সব রাজনৈতিক নেতৃত্ব কতটা আত্মসমর্পণ করবেন তৃণমূলের কাছে, সে সম্পর্কেও সন্দেহ রয়েছে।

রাজ্যের তৃণমূল নেতৃত্ব ভেবেছিলেন যে ত্রিপুরাও হবে পশ্চিমবঙ্গের মতো। একই খেলায় মেতেছিলেন তারা। অনেক হামলার নাটক তারা করলেন পুরনির্বাচনের আগে। হয়তো রক্তও ঝরল। কিন্তু কোথাও ত্রিপুরার শাসক দলের কোনো সমর্থক বা যোগের প্রমাণ পাওয়া যায়নি সেই সব হামলার পিছনে। ত্রিপুরার জনগণ এটা পুরনির্বাচনে বুঝিয়েও দিয়েছেন। ফল দেখলেই সেটা একেবারে স্পষ্ট। মোট ৩৩৪ ওয়ার্ড আছে পুরনিগমে, ১৩টি পুরপরিষদ এবং ৬টি নগর পঞ্চায়েতের ভোট হয়েছে ত্রিপুরায়। ১১২টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজেপি জিতেছে। সব মিলিয়ে বিজেপি পেয়েছে ৩২৯টি আসন। ৩টি আসন পেয়েছে বামেরা। একটি করে আসন পেয়েছে তৃণমূল ও তিপ্রা মথা। পুরপরিষদ ফলাফল এক নজরে বিজেপি-২১৭, সিপিএম-৩, তৃণমূল-১, অন্যান্য-১, নগর পঞ্চায়েত সবগুলিই বিজেপির, এখানেই একটি আসন গেছে সিপিএম-এর দখলে। আর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের শাসক দল এই ১টি আসন পেয়েই যেন ত্রিপুরা পেয়ে গেছে বলে মনে করছে। একটি বিষয় এরা বলে থাকেন যে নির্বাচনের সময়ে বহু বহিরাগত নেতৃত্ব রাজ্যে আসা যাওয়াটাকে, ডেলি প্যাসেঞ্জারির মতো করে নিয়েছিল। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তৃণমূলের ছোটো, বড়ো ও মাঝারি, সব নেতৃত্বই হাজির হয়েছিল এই প্রচারে। স্থানীয় মানুষজনের কথায়, এদের মিছিল বা মিটিং দেখা যায়নি কোনো স্থানীয় প্রতিনিধি বা সমর্থকদের। প্রচার মিছিলেও পা মেলাতে দেখা যায়নি বিপুল জনগণকে। তা সত্ত্বেও তারা দাবি করেছিলেন, যে তারাই পুরনিগমের নির্বাচনে বহু জায়গায় জিতবেন। আদতে ত্রিপুরার জনগণ এদের বহিরাগত তকমা না দিলেও, ভোটের ময়দানে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তোমাদের অতিথি হিসেবে স্বাগত জানালেও, আদতে ক্ষণিকের অতিথি। রাজ্যের শাসনভার তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। তৃণমূল কংগ্রেস অনেক প্রতিশ্রুতি এবার দিয়েছে। কর্মসংস্থান থেকে উন্নয়ন। সেক্ষেত্রে ত্রিপুরার জনগণ এটাই বুঝিয়ে দিয়ে রায় দিয়েছে যে, যে দল তাঁর রাজ্যে এসে রাজ্যকে কয়েক কদম পিছিয়ে দিয়েছে, তাঁদের ভুরি ভুরি মিথ্যার জালে ফাঁসবেন না তারা।

এরপর তৃণমূলের টার্গেট ছিল গোয়া। সুপ্রিমো ছুটে গেছেন সেখানে। সফলতা একেবারে তলানিতে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছেন, যা ভেবেছিলেন, তা হয়নি। লাভ বলতে টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ ও গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফেলেইয়া, সঙ্গে প্রাক্তন অভিনেত্রী নাফিসা আলি। সব ক্ষেত্রেই ঘর ভেঙেছে কংগ্রেসের। যেখানে নিজের রাজ্যেই সুপ্রিমো গণতন্ত্রের গলা টিপে মারেন, সেখানে গোয়ায় তিনি নাকি প্রতিষ্ঠা করবেন গণতন্ত্র? এই প্রশ্ন তুলেছে গোয়ার রাজনৈতিক মহলের একাংশ। সামনে গোয়ার বিধানসভা নির্বাচনে কে হবেন তৃণমূলের প্রজেক্টেড মুখ্যমন্ত্রী, পেজ না ফেলেইরো। এটা নিয়েও চর্চা তুঙ্গে। আর ইতিমধ্যেই গোয়াতেও তৈরি হয়েছে কয়েকটি গোষ্ঠী। আর সেই সঙ্গে জন্ম নিয়েছে দ্বন্দ্ব। গোয়ার রাজনৈতিক মহল অবশ্য বলছে যে তৃণমূলের কোনো প্রভাব পড়বে না গোয়ার রাজনীতিতে।

তাহলে কাকে নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এগোবেন মমতা। কংগ্রেস আসবে না। কেননা এখন তাঁদের ঘর ভাঙছেন মমতা। অন্যদিকে দেশের সিংহভাগ কেন্দ্রের বিজেপি বিরোধী শিবির এখনও রয়েছে কংগ্রেসের পাশে। মমতার মহারাষ্ট্র সফরের দিকে লক্ষ্য দিলে দেখা যাবে, সেখানে তিনি ইউপিএ নামক একটি জোট বন্ধনকে কার্যত অস্বীকার করেছেন। আর এক প্রভাবহীন ভারতীয় রাজনীতিক শরদ পাওয়ারের দ্বারস্থ হয়েছেন মমতা। রাজনৈতিক মহলের একটি সূত্র মনে করছে, শরদ পাওয়ারের হাত ধরে বিরোধীদের কাছে নিজেদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার একটা চেষ্টা করেছেন মমতা। কতটা এই প্রচেষ্টা সফল হবে তা বলবে ভবিষ্যৎ।

মমতার প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন কি অধরাই রয়ে যাবে? নাকি দিবা স্বপ্নের রূপ নেবে? সেটা মমতা নিজেই জানেন। এটাও জানেন যে, জাতীয় রাজনীতির হালে পানি পেতে তাঁকে সংগঠন সারা দেশে ছড়িয়ে দিতেই হবে। নইলে অন্তত দিল্লির রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর দল ও তিনি কুলীন যে হবেন না, সেটা তিনি বুঝে গেছেন। আর সেক্ষেত্রে একমাত্র দেশের অন্য রাজনৈতিক দল, জাতীয় কংগ্রেসের দুরবস্থাকে যে হাতিয়ার করে এগোতে চাইছেন, সেটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর এখানেই যে তাঁর স্বপ্নের সমাধি ঘটবে, সেটার দিকেও ইঙ্গিত করেছে রাজনৈতিক মহল। □

ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি

২০১৯ সালে বারাণসীতে দেশকে পাঁচ লক্ষ ডলার অর্থনীতির মাইলস্টোনে পৌঁছনোর সংকল্প নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ধীর পায়ে সেই পথেই এগোচ্ছে ভারত।

নিখিল চিত্রকর

করোনা ধাক্কা সামলে ভারতীয় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে একুশের শেষলগ্নে এসে। গত অর্থবর্ষের তুলনায় এই অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেশের বৃদ্ধির হার অনেকটাই বেশি। যা আশার আলো দেখাচ্ছে দেশের অর্থনীতিকে।

আট শতাংশ বৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী মাত্রা ছুঁয়ে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতি হিসেবে এখন অনেকটাই স্বস্তিতে ভারত। দ্বিতীয় ঢেউয়ের শেষে কোভিড সংক্রমণের গ্রাফ নিম্নমুখী হওয়ার পর থেকে দেশের আর্থিক লেনদেন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। কোভিডের ডেলটা ভ্যারিয়েন্টের প্রভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) শেষে টাকার অঙ্কে দেশের জিডিপি পৌঁছেছিল ৩২.৩৮ লক্ষ কোটি টাকায়। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে ভারতীয় অর্থনীতির উপর সেই অতিমারীর প্রভাব কমে আসার লক্ষণ সুস্পষ্ট। জুলাই-সেপ্টেম্বরে ত্রৈমাসিক জিডিপির মূল্য বেড়ে হয়েছে ৩৫.৭৩ লক্ষ কোটি টাকা। ভারত সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরের প্রকাশিত তথ্যে জানানো হয়েছে, গত বছরের ৭.৪ শতাংশ সঙ্কোচনের তুলনায় এ বছর জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে দেশের জিডিপি বেড়েছে ৮.৪ শতাংশ। চলতি আর্থিক বছরের জুন ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে জিডিপি। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে কৃষি, আবাসন, উৎপাদন ও পরিবহণ শিল্প। সে কারণেই জিডিপি'র গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে এই বৃদ্ধির হার প্রত্যাশিতই ছিল। নভেম্বরের শেষে সংবাদসংস্থা রয়টার্সের এক সমীক্ষায় ৪৪ জন অর্থনীতিবিদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধি ৮.৪ শতাংশ হবে বলে জানিয়েছিলেন।

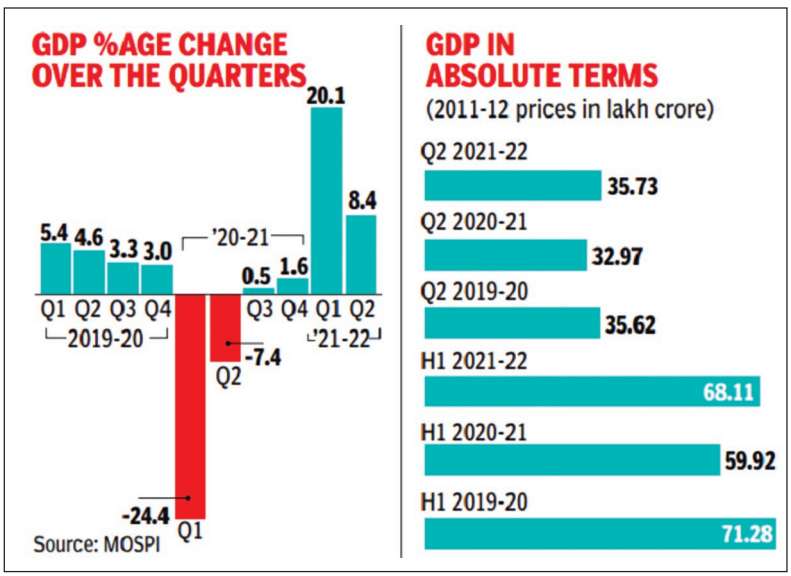

এ বছর বর্ষা মরসুমের দীর্ঘস্থায়ী হওয়া এবং অতিবৃষ্টি সত্ত্বেও অক্টোবর মাসে কয়লা, ইস্পাত, সার, বিদ্যুৎ, অপরিশোধিত তেল, পেট্রো রসায়ন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও সিমেন্ট---এই আটটি বুনিয়াদি শিল্পে উৎপাদন বেড়েছে ৭.৫ শতাংশ। সেপ্টেম্বর মাসে ওই বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছিল ৪.৪ শতাংশে। ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিসের প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে--- কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রো-রসায়ন, সার, ইস্পাত, সিমেন্ট ও বিদ্যুৎ উৎপাদন গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। উল্লেখ্য, দেশের সার্বিক শিল্পোৎপাদনের মোট সূচকের ৪০.২৭ শতাংশ অধিকার করে রয়েছে ওই আটটি বুনিয়াদি শিল্প।

পুজো মরসুমের ঠিক আগে ব্যক্তিগত

ভোগব্যয়ের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের পরিমাণ এপ্রিল-জুন পর্বের ১৭.৮৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে জুলাই- সেপ্টেম্বরে হয়েছে ১৯.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা। গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (জিডিপি) এবং ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ গত ৯টি ত্রৈমাসিক ধরে কৃষি ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশের উপরে থাকা।

বিগত প্রায় এক বছর ধরে দেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। লকডাউন উঠে যাওয়ার পর থেকেই স্বাভাবিক হয়েছে কৃষি, উৎপাদন, পরিষেবা-সহ একাধিক শিল্পক্ষেত্র। এর প্রভাবে তলানিতে ঠেকে যাওয়া জিডিপি ফের মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

কোভিড ভ্যাকসিনের হার বৃদ্ধি এবং জ্বালানি শুল্ক কমানোর ফলে বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে এবং বাজারে চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মত অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের। এর ফলে করোনার সাম্প্রতিক স্ট্রেন ওমিক্রনের আতঙ্কের মধ্যেও দেশের অর্থনৈতিক গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছে পরিসংখ্যান।

মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কে.ভি সুব্রহ্মণ্যম অবশ্য বলেছেন, ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং শক্তিশালী ব্যাঙ্কিং সেক্টরের সাহায্যে ভারতীয় অর্থনীতি ২০২১-২২ অর্থবর্ষে দুই সংখ্যার হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তিনি জানান, প্রাথমিক দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কার এই দশকে দেশকে ৭ শতাংশের বেশি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। যার অর্থ, কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রভাব কাটিয়ে শিল্পক্ষেত্রেও দ্রুগতিতে ছন্দে ফিরছে।

দেশের উৎপাদনক্ষেত্রে যেমন বৃদ্ধি হয়েছে, তেমনি কমেছে সরকারি ব্যয়ভার। চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে সরকারি ব্যয় প্রথম ত্রৈমাসিকের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। এপ্রিল-জুন পর্বে সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪,২১,৪৭১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩ শতাংশ), যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে কমে হয়েছে ৩,৬১,৬১৬ কোটি টাকা (ডিপিপি'র ১০.১ শতাংশ)।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, করোনা ভাইরাসের প্রথম ধাক্কায় দেশের অর্থনীতি যেভাবে হোঁচট খেয়েছিল, দ্বিতীয় ধাক্কায় সেই পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি। জুন থেকে সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকের জিডিপি বৃদ্ধির হার তারই ইঙ্গিত। এর আগেও পরপর তিন ত্রৈমাসিকে দেশের আর্থিক বৃদ্ধি ছিল পজিটিভ। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ০.৫ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ১.৬ শতাংশ। ২০২১-২২ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টার অর্থাৎ জুন ত্রৈমাসিকে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ২০ শতাংশেরও বেশি। তারপরই চলতি ত্রৈমাসিকে ৮.৪ শতাংশ বৃদ্ধির হার ধরে রাখল দেশের অর্থনীতি। যা অর্থনীতির জন্য ভালো খবর বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ।

যদিও অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করছেন, জিডিপির এই বৃদ্ধি গত বছরের সংকোচন হারের ক্ষতিপূরণ মাত্র। করোনার ধাক্কায় গত অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে (এপ্রিল ২০২০-জুন ২০২০) ভারতের জিডিপি বা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন রেকর্ড ২৪.৩৮ শতাংশ হারে সংকুচিত হয়। সেই ধাক্কা গত ৩ ত্রৈমাসিক থেকেই ধীরে ধীরে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। কোভিড নিষেধাজ্ঞা শিথিল হওয়ায় দেশের পর্যটনশিল্পে গতি এসেছে। সর্বসাধারণের ব্যক্তিগত ভোগব্যয়ের পরিমাণ বেড়েছে। সেই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ আসায় আর্থিক মন্দা কাটিয়ে উঠছে ভারতের বাজার। সেই নিরিখেই কেন্দ্রের দাবি, সেপ্টেম্বরের আর্থিক বৃদ্ধির হার প্রমাণ করছে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সঠিক দিশায় এগোচ্ছে ভারত।

তবে দেশের এই আর্থিক বৃদ্ধি আগামীদিনে ধরে রাখা যাবে কিনা, সেটা পুরোটাই নির্ভর করছে অতিমারির আগামীদিনের রূপরেখার উপর। কারণ করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন ইতিমধ্যেই বিশ্বের একাধিক দেশে থাবা বসিয়েছে। সংক্রামক এই স্ট্রেন যদি ভারতকে প্রভাবিত করে, তাহলে ফের অর্থনীতি ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। তার আগে জিডিপি বৃদ্ধির এই হার স্বস্তি দিচ্ছে অর্থমন্ত্রককে।

অন্যদিকে এশিয়ার তথাকথিত হবু সুপারপাওয়ার চীনের আর্থিক বৃদ্ধি ততটা আশাপ্রদ নয়। কোভিড বিপর্যয় থেকে চীনের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত ঠিকই কিন্তু বৃদ্ধির হার মসৃণ নয়। ১৫ জুলাই ২০২১-এ চীনের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো ঘোষণা করেছে যে বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের তুলনায় চীনের জিডিপি ৭.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় অনেকটাই কম।

এপ্রিল-জুন মাসে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে চীনের এই জিডিপি বৃদ্ধির হার সে দেশের অর্থনীতিবিদদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। চীনা অর্থনীতির কাইজিন সমীক্ষায় পূর্বাভাস ছিল, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার হবে ৮.২ শতাংশ। রয়টার্সের সমীক্ষায় সেই বৃদ্ধির হার ছিল ৮.১ শতাংশ। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের সমস্ত পূর্বাভাস ব্যর্থ করে চীনা জিডিপি এসে থেমেছে ৭.৯ শতাংশের হারে। যা খুব একটা স্বস্তি দিচ্ছে না জিনপিং সরকারকে।

এদিকে খুব ছোটো ছোটো লক্ষ্য সামনে রেখে ধীর পায়ে এগোচ্ছে উন্নত ভারত। দেশের সার্বিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে আমূল অর্থনৈতিক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। জিএসটি, ডিমনিটাইজেশন সেই সংস্কারের ইতিবাচক পদক্ষেপ। অতিমারি পর্বের আগে ২০১৯ সালে বারাণসীতে দেশকে পাঁচ লক্ষ ডলার অর্থনীতির মাইলস্টোনে পৌঁছনোর সংকল্প নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ধীর পায়ে সেই পথেই এগোচ্ছে ভারত।

□

তৃণমূলের বিষদাঁত ত্রিপুরার মানুষ ভেঙে দিয়েছেন

'উপুর মুখে থুতু দিলে/নিজের মুখে পড়ে'— প্রচলিত প্রবাদটি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে, কারণ পেট্রল ও ডিজেলের দাম কেন্দ্র কমিয়েছে। কিন্তু অবিজেপি রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার দাম কমায়নি। পাশাপাশি দ্বিতীয় স্ট্রোক হলো কেন্দ্র রেশনের ভরতুকি তুলে নিচ্ছে। এমাসেই শেষ। আমরা এতদিন শুনে আসছিলাম তৃণমূল সরকার সকলকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে। আর শুনতাম কেন্দ্রের কোনওরকম সাহায্য পাচ্ছে না। ঠেলার নাম বাবাজী এখন। সৌগত রায় বলেছেন, ভরতুকি তুলে দিয়ে কেন্দ্র অন্যায় করছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বোকা বানানোর দিন শেষ হলো বুঝি। এরপরেও যদি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিজের অমূল্য ভোটটা দিতে না পারে সন্ত্রাসের ভয়ে তাহলে আরও কতকিছু দেখতে হবে আগামীতে তা শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

অন্যদিকে, ধ্রুব সত্যটি হলো তৃণমূল অন্যরাজ্যে গিয়ে দোকান খুলতে পারছে না। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বলেছেন, ত্রিপুরার মানুষ দুটি দল পছন্দ করেন। একটি সরকার অন্য একটি বিরোধী। বড়ো বিরোধী দল বামফ্রন্ট। তাহলে তৃণমূলের আশা পূরণ হবে কী করে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি নেতা কর্মীদের ক্ষমতাসীন শাসকদল সবসময় সর্বস্থানে ক্ষণে ক্ষণে আক্রমণ করেছে, খুন করেছে, মেরে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, বোন ও মায়ের ইজ্জত কেড়ে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সবসময় ছোট্ট ঘটনা, বাচ্চারা ভুল করেছে ইত্যাদি বলে কাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন যারা মার খাচ্ছে তারা সাধারণ নিরপেক্ষ মানুষ, তারা কারো সাতে পাঁচে নেই। তারাই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় নিয়ে আসেন আর সৌভাগ্যক্রমে উনি সকলের অভিভাবক। বস্তুত আমরা দেখলাম ঘুমিয়ে থাকা পশ্চিমবঙ্গ সরকার আক্রান্তদের পাশে কিন্তু দাঁড়াননি। পুলিশমন্ত্রী হয়েও দোষীদের শাস্তি দিলেন না। এখন উনি ত্রিপুরা, ইউপি, গোয়ায় গেছেন আধিপত্য বিস্তার করতে। তাই ভাবি, যারা গণতন্ত্রের পূজারি বলে মাইকে গলা ফাটাচ্ছেন, তাদের নিজের রাজ্যের গণতন্ত্র কতটা সুরক্ষিত? তাহলে মানবাধিকার কমিশন এল কেন? আর কুণাল, অভিষেক বলেছেন, ইউপি, গোয়া, ত্রিপুরায় নাকি গণতন্ত্র নেই। আমি জানতে চাই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কী? বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মারার নাম কি তাহলে গণতন্ত্র? তৃণমূলের নেতাদের পদচারণে ত্রিপুরায় গণতন্ত্র ধ্বংস শুরু হয়েছে। দেবাংশু-সহ আরও যারা গিয়েছিলেন তারা তো তৃণমূল দলের সন্ত্রাসের চেহারা দেখিয়ে এসেছে। এটাই তো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখছেন।

তাই, বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উচিত শুরুতেই তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের আটকে দেওয়া। নাহলে এই রাজ্যের মতো দশা দেখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীদের হাত, পা ভেঙে দিচ্ছেন, 'ল অ্যান্ড অর্ডার' শিকেয় তুলে রেখেছেন, হিটলারি শাসন চালাচ্ছেন। তারাই ত্রিপুরা, গোয়া, ইউপি গিয়ে বলেছেন, 'ল অ্যান্ড অর্ডার' ভেঙে পড়েছে। কথাগুলো যেন হাসির খোরাক জোগায়। খবরে সবসময় প্রচার যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ আক্রান্তদের এফআইআর নিতে চান না। নারীরা ধর্ষিত হচ্ছেন। এফআইআর করতে গেলে বড়োবাবু টাকা নিয়ে মিটিয়ে নিতে বলেন। বিজেপির বিধায়কদের ফোন করে বলেন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিন না হলে লকআপে ঢুকিয়ে দেব। এরকম নানান অত্যাচারের জর্জরিত কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপির নেতা-কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গে। তবুও বিরোধী দলের কর্মীরা অন্যায়ের কাছে হার মানেননি। এমনকী উপনির্বাচনেও বিজেপি প্রার্থীকেও রেয়াত করেননি শাসক দল। প্রচারে বাধা দিয়েছে, কর্মীদের মেরে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে। এত কাণ্ড করার পরেও তৃণমূলের নেতারা প্রশ্ন করলে বলেন, বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তৃণমূল নেতারা সত্য ঘটনাকে মিথ্যা বলে দেখাতে চান। বিজেপি কর্মীদের ত্রাহি ত্রাহি রব আর শাসক দল বলেছে, পারিবারিক কলহের জের বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। আমরা দেখলাম, হাজার হাজার অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্যপাল স্বচক্ষে পরিদর্শন করলেন একাধিক জেলা। রাজ্যপাল প্রতিক্রিয়া দিলে বলা হচ্ছে বিজেপির পক্ষপাতিত্ব করছেন। এরপরও শিলচরের সুস্মিতা দেবকে বলছি, আপনি কি বাংলা সংবাদপত্র পড়েন না? আজ তৃণমূলের সঙ্গে ত্রিপুরার মানুষ যা করছেন, সেটা যদি অন্যায় হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সঙ্গে যা হয়ে আসছে সেটাও অন্যায়, অধর্ম নয় কি?

তাই, সুস্মিতা দেব, কুণাল ঘোষ, রাজীব ব্যানার্জি, অভিষেকরা রাজ্যপালের কাছে দরবার করুন বা নালিশ করুন ওই একটাই উত্তর পাবেন, 'হয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নয়তো পারিবারিক কলহ'। যেটা পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের দিলীপ ঘোষ, সুকান্ত মজুমদার, অর্জুন সিংহ, রাহুল সিনহা, লকেটদি, সৌমিত্রদার মতো আক্রান্তদের শুনতে হয়। তাই তৃণমূলের বিষদাঁত ত্রিপুরায় যেমন সেখানকার মানুষ ভেঙে দিয়েছেন, গোয়ার মানুষ সেভাবেই ভেঙে দেবে।

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

তৃণমূলের খেলা ত্রিপুরায় শেষ

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিপুল ভোট পেয়ে রাজ্যের মসনদে পুনরায় মমতা ব্যানার্জি বসেন। ভোটের আগে মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার স্লোগান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং প্রচার করেন। তার খেলা হবে এই ভয়ংকর স্লোগান পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে কলুষিত করে। ভোট পরবর্তীতে প্রায় ১৫৫ জন ভারতীয় বিচার ধারার হিন্দু ভোটারকে এরা খুন করছেন। অসংখ্য মহিলাকে ধর্ষণ করেছেন। হাজার হাজার সাধারণ বিরোধী ভোটারকে ঘরছাড়া করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ভোট পরবর্তী হিংসা

নিয়ে গোটা দেশ তথা বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছে। তা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই ঘটনাগুলিকে অস্বীকার করেছেন। এমনকী মানবাধিকার কমিশন ও কোর্টকেও তিনি কটূক্তি করতে ছাড়েননি। তারা এই মানুষের জীবন নিয়ে খেলার স্লোগান নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে অশান্তি করতে গিয়েছিলেন। ত্রিপুরার মানুষ সমর্থন করেননি। পশ্চিমবঙ্গের কিছু চটিচাটা মিডিয়াকে কিনে নিয়ে ত্রিপুরায় নিজেরাই অশান্তি পাকিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে ত্রিপুরায় গণতন্ত্র নেই বলে প্রচার করেন।

ত্রিপুরার সচেতন মানুষ এই প্ররোচনায় পা বাড়ায়নি। একটা তিন বছরের সরকার ত্রিপুরার মাটিতে যে উন্নয়ন করছে তা ত্রিপুরাবাসী জানেন। তাই পশ্চিমবঙ্গের ভিক্ষার রাজনীতি তারা ত্রিপুরার মাটিতে প্রবেশ করতে দেননি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত তোলাবাজ নেতা-নেত্রী নিয়ে গিয়ে কোটি কোটি টাকা খরচ করে ত্রিপুরার মাটিতে আবার অশুভ স্লোগান 'খেলা হবে' বলে যে খেলতে গেলেন সেই খেলায় একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে হেরে গেলেন। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরার মাটিতে আপাতত তৃণমূলের খেলা শেষ হলো। পশ্চিমবঙ্গে যে খেলা শুরু করেছিল মানুষের রক্ত নিয়ে, বেকারদের চাকরি নিয়ে, গরিব মানুষের অধিকার নিয়ে— সেই খেলা ত্রিপুরার মাটিতে আপাতত শেষ হলো। যতই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বাইরের রাজ্যে খেলা হবে স্লোগান দিক ওখানকার মানুষ তা সমর্থন করবেন না। একটা আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার, বেকারদের বঞ্চিত করে ভিক্ষার রাজনীতি করা। বিশেষ সম্প্রদায়ের ভোটে জয়ী হয়ে আত্মঅহংকারে ভর্তি হয়ে ত্রিপুরার মাটিতে একটা পৌরসভা জয় করতে পারে না। তিনি আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। সাধারণ মানুষের উপর পেট্রোল, ডিজেলের এক পয়সা কমাতে পারেন না, তিনি মদের উপর ছাড় দিচ্ছেন। তিনি খেলবেন আন্তর্জাতিক খেলায়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে নোংরা খেলা দেখছেন তা ভারতবর্ষের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সেই খেলাটা আশা করি ভবিষ্যতে দেখতে চাইবেন না।

—চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোণা রোড, পশ্চিম মেদিনীপুর

'পার্ক আন্ডার লকডাউন'

বর্তমানে সকল স্থানেই একটি বিশেষ জিনিস আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। শহরে এবং শহরতলীতে যত পার্ক আছে সবকটাই সৌন্দর্যায়নের নামে চারিদিকে লোহার রডের পাঁচিল দেওয়া হয়েছে। গেট লাগানো হয়েছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু নাগরিকদের তাঁদের প্রয়োজনে পার্ক ব্যবহার করাটা নির্ভর করছে কিছু ব্যক্তির মর্জির উপর। যারা করুণাময়ীর করুণায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। কারণ গেটে তালা লাগানো থাকে। চাবি জনগণের সম্পত্তি রক্ষাকারী ব্যক্তির পকেটেই।

অতএব পার্কটি কে, কেন, কখন, কার নির্দেশে ব্যবহার করবেন তার উপরই নির্ভর করছে তালার সঙ্গে চাবির সংযোগ হবে কি না। এ প্রসঙ্গে গ্রামবাঙ্গলার একটি কাহিনির কথা সকল পাঠকের নিকট রাখছি। গ্রামের এক কৃষক ওই গ্রামেরই বিচারক সাহেবের কাছে জানতে চাইলেন— দুটি ষাঁড় পরস্পরের মধ্যে লড়াই করে একটি মারা গেলে— বিচারে কী হবে? বিচারক সাহেব সহজেই উত্তর দিলেন— কী আর হবে? কিছুই না। ষাঁড়কে তো কেউ শিখিয়ে দেয়নি অপর ষাঁড়টিকে মারার জন্য। অবোলা জীব। কোনো শাস্তিই হবে না। একথা শোনার পর কৃষক আবার বিচারক সাহেবকে বললেন— ব্যাপারটা একটু আলাদা প্রকার। ধরুন আমার ষাঁড় এবং আপনার ষাঁড়ের মধ্যে লড়াই লাগে এবং আপনার ষাঁড়টি মারা পড়ে। তাহলে বিচারে কী হবে?

বিচারক সাহেব লাফিয়ে উঠে বললেন— 'হাজার টাকা জরিমানা আর আমাকে একটি বড়ো যুবক ষাঁড় কিনে দিতে হবে।' আসলে ষাঁড় কার তার উপর বিচার নির্ভর করছে, ন্যায় অন্যায়ের উপর নির্ভর করে নয়। তেমনি কে বা কারা পার্ক ব্যবহার করবে তার উপর নির্ভর করছে, চাবি-তালা সংযোগ হবে কিনা যদিও পার্ক জনসাধারণের জন্য, জনগণের করের টাকায় তৈরি যথাযথ কাটমানি প্রদানের পর। এরপরও বলতে বাধা থাকে 'পার্ক আন্ডার লকডাউন।'

—তপন কুমার বৈদ্য,
দমদম, কলকাতা-৭৪।

এই বেশ আছি

তেল পেরলো দু'শো টাকা আলুর কিলো কুড়ি,
কেমন করে ভাজব দিদি চপ-সিঙ্গাড়া-মুড়ি?

শাকের আঁটি দুইয়ের ঘরে অগ্নিমূল্য বাজার,
দুটাকার চাল ফোটাতে গ্যাসের খরচ হাজার।

বউয়ের পাওয়া পাঁচশো দিয়ে নেটের পেটটা ভরে,
সবুজসাথী চড়ে মেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে।

অসুখ হলে সর্বস্বান্ত থালা-বাটি-ঘটি,
স্বাস্থ্যসাথীর বিজ্ঞাপনে খরচ হাজার কোটি।

টেলিভিশনে শুনছি রোজই প্রশান্তীয় ভাষণ,
পাড়ায় আছে সরকার আর দুয়ারে রেশন।

শুনেছিলাম শিল্প হবে লক্ষ কোটি কাজ,
ভোটের আগের প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল আজ?

রানি হারেন রানি জেতেন চড়েন সিংহাসনে,
ক্যারিপ্যাকে 'বাংলা' এখন বিশ্বের অঙ্গনে।
আপনি হবেন প্রধানমন্ত্রী ভাইপো হবে রাজা,
আমরা বসে পাড়ার মোড়ে ভাজব তেলেভাজা।

—মদন রুইদাস,
গড়বেতা, মেদিনীপুর।

স্নেহের সম্পর্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব মা-বাবার

বৃষ্টি মজুমদার

রনি আর ঋদ্ধিমার মধ্যে বয়েসের তফাত মাত্র তিন বছরের। কিন্তু এখনই পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ততায় ভরে উঠছে। ছোটো ছোটো জিনিস নিয়ে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া যেন লেগেই রয়েছে। অনেক বোঝানোর পরও কোনো লাভ হচ্ছে না। পরিস্থিতি দিনের পর দিন আরও খারাপ হতে থাকছে।

প্রথম সন্তানের পর যখন দ্বিতীয় সন্তান আসে, তখন স্বভাবতই প্রথম সন্তানের পক্ষে নতুনকে মেনে নেওয়া একটু কঠিন হয়ে যায়। এতদিন বাবা-মা, পরিবারের বাকি সদস্যদের কাছে সে যেভাবে গুরুত্ব পেত, তখন সেটা তুলনামূলক অনেকটাই কমে যায়। আরও সহজ ভাবে বলতে গেলে সকলের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই ছোটো পুচকে। যাকে নিয়ে বাড়ির সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

'ঈর্ষা' শব্দটা শুনতে খারাপ লাগলেও ভাই-বোন বা ভাই-ভাই অথবা দু'বোনের মধ্যে এ বিষয়টা সচরাচর জায়গা করে নেয়।

ভাই-বোনের মধ্যে ঈর্ষা যে কোনও বিষয় থেকেই জন্মাতে পারে। যেমন, প্রথম সন্তান জন্মাবার পর অনেক বাবা-মা-ই তাকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেন না। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান জন্মাবার পর সে যখন সব সুযোগ সুবিধা পেয়ে যায়, এ থেকেই বপন হয় দু'সন্তানের মধ্যে ঈর্ষার বীজ। আবার কোনও কোনও পরিবারে ছেলে-মেয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি করা হয়। ছেলেকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার ফলে মেয়ের মধ্যে গোপন ঈর্ষা তৈরি হয়।

পাঁচ বছর আর আট বছর বয়সের সন্তানের পছন্দ প্রায় একই থাকে। যেমন, একই খেলনা দু'জন সন্তানের জন্য আপনি কিনে নিয়ে গেলে তাদের পছন্দ হয়। কিন্তু সন্তান যত বড়ো হতে থাকে, দশ বছর থেকে তেরো বছর বয়সের বাচ্চার মধ্যে আলাদা আলাদা পছন্দের বিষয়টা দেখা দিতে থাকে।

সন্তান কিন্তু জন্মগত ভাবে ঈর্ষা নিয়ে আসে না। শিশুর মধ্যে ঈর্ষাবোধ তৈরি করার প্রবণতা কখনওই সঠিক পদক্ষেপ নয়। তাই প্রথম পদক্ষেপটা নিতে হবে বাড়ি থেকেই। অর্থাৎ দায়িত্বটা নিতে হবে বাবা-মাকেই। এ বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

● শিশুকে বোঝানোর দায়িত্ব মা-বাবাকেই নিতে হবে। শিশুকে প্রথমেই বোঝাতে তাদের চোখে দুই সন্তানই সমান। বাবা-মা দু'জনকেই সমান ভালোবাসেন।

● দ্বিতীয় সন্তান জন্মাবার আগে প্রথম সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন। সন্তানকে সব সময় উৎসাহিত করুন। দ্বিতীয় সন্তান জন্মাবার পর প্রথম শিশুকে নিয়ে তার ছোটো ভাই বা বোনের জন্য শপিং করতে বেরোন। ছোটো ভাই বা বোনের জন্য তাকেও কিছু করতে দিন। পছন্দমতো কিছু কিনতে দিন। ফলে তার মনেও ছোটো ভাই বা বোনকে নিয়ে উৎসাহ বাড়বে।

● দু'জন শিশু মধ্যে কখনও পার্থক্য করবেন না। এতে শিশুর মধ্যে ঈর্ষা তৈরি হবে না। একজনকে আদর করবেন, আর একজনকে করবেন না— এমন করবেন না। এতে ওর মনে হতে পারে মা-বাবা, ভাই বা বোনকে বেশি ভালোবাসে। যখন কোনও গিফট কিনবেন, তখন দু'জনের জন্য সমান উপহার কিনবেন। তাতে কারোর মনে কোনও ক্ষোভ তৈরি হবে না।

● সবার মেধা সমান হয় না। তাই পরস্পরের মধ্যে মেধা নিয়ে তুলনা করা উচিত নয়। প্রতিদিন যদি একই কথা বাচ্চা শুনতে থাকে যে, তার দাদা বা দিদি তার থেকে পড়াশোনায় বেশি ভালো, এতে শিশুর মনে জটিলতা তৈরি হতে পারে। তাই দু'জনের প্রতিভার মধ্যে তুলনা না করে, বরং যে যে-প্রতিভায় এগিয়ে সেটাতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ জোগান।

● ভাই-বোনের মধ্যে ঝগড়া, মারপিঠ, খুনসুটি হতে পারে, সেখানে আপনি ঢুকে পড়বেন না। সাধারণত এরকম ঝামেলায় বাবা-মা বিশেষ একজনের পক্ষপাতিত্ব করে ফেলেন। এখানেই জায়গা করে ফেলে ঈর্ষা। এরকম পরিস্থিতি খুব সাবধানে মেটানোর চেষ্টা করুন। প্রথমে দু'জনের কথা মাথা ঠাণ্ডা করে শুনুন। তারপর বিষয়টার মীমাংসা করুন। মীমাংসা করতে যেন পক্ষপাতিত্ব করে ফেলবেন না বা একজনের কথা শুনে অন্যকে শাস্তি দেবেন না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দু'জনের সুবিধা-অসুবিধাটা দেখুন। তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন।

● সন্তানের সামনে নিজেদের মধ্যে কখনও ঝগড়া করবেন না। এতে খারাপ প্রভাব পড়ে সন্তানের ওপর। শিশুরা যদি এরকম পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার মধ্যে ঈর্ষা, হিংসা তৈরি হবে না। □

আক্কেল দাঁতের সমস্যায় হোমিওপ্যাথি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

আমাদের সকলেরই চার-চারটি আক্কেল দাঁত ওঠে। আক্কেল দাঁত ওঠার সময় নানারকমের সমস্যা হয়। অনেক সময় পর্যাপ্ত স্থানের অভাবে পূর্ণ বয়সে আক্কেল দাঁত ঠিকমতো উঠতে না পেরে চোয়ালের ভিতর বা নীচের দিকে গজাতে থাকে। আর সবচেয়ে অদ্ভুত কথা হলো এর আকৃতি কখনও বাঁকা, কখনও শোওয়াটে ধরনের হয়। যার ফলে সাধারণ দাঁতেও চাপ পড়ে সেখানে ব্যথা হতে থাকে। এটা স্বাভাবিকভাবে বেরোতে না পারলে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা, মাড়ি ফুলে যাওয়া, অন্যান্য দাঁতে চাপ পড়ে ইত্যাদি। পাশের দাঁতে ধাক্কা মারলেই মাড়িতে ব্যথা হয়।

যখন আক্কেল দাঁত সম্পূর্ণভাবে উঠতে পারে না, তখন দাঁতের মুকুট অংশটি উপরিভাগের মাংস বা মাড়ির নীচে থাকে। তখন মাঝখানে ফাইবার (সাধারণ বাংলায় খাবারের কণাগুলো) জমতে থাকে ও ক্রমশ তা জমতে জমতে জায়গাটা জীবাণুতে ভরে ওঠে। দাঁত, মাড়ি ফুলে ওঠে। তীব্র ব্যথা তো হয়ই, উপরন্তু উপরের দাঁতের সঙ্গে মাড়ির ক্রমাগত কামড়ে ঘা তৈরি হয়। চোয়ালের ভেতরে অবস্থানকারী একটি আক্কেল দাঁত সবকটি দাঁত পড়ে যাওয়ার পরে বেরিয়ে আসতে পারে। এর ফলে মাড়ির স্বাভাবিক দাঁতটি ক্রমাগত ধাক্কা খেতে খেতে ক্রমশ হেলতে থাকে। এর ফলে চোয়ালের সামনের দিকের দাঁতগুলো বিচ্ছিন্ন বা আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে পারে। পরবর্তীকালে এর থেকে নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে— মাড়ির সংক্রমণ, হাড়ের প্রদাহ, দাঁতের প্রদাহ ও দাঁতের স্নায়ুর উপর চাপ ইত্যাদি।

আক্কেল দাঁতের সমস্যার একমাত্র চিকিৎসা হলো দাঁতটি তুলে ফেলা। তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তা তুলে ফেলা হচ্ছে ততক্ষণ মুখের ভিতরের অংশের পরিচ্ছন্নতার দিকে নিয়মিত নজর দিতে হবে। যাতে আক্কেল দাঁত ও নরম মাংসখণ্ডটির মাঝে কোনও খাবারের টুকরো আটকে না থাকে। প্রতিবার খাবার খাওয়ার পর অল্প গরম জলে কুলকুচি করলে ব্যথা ও ফোলার অনেকটাই উপশম হয়। তবে স্বাভাবিকভাবে দাঁত না বেরোনো পর্যন্ত কোনওরকম স্থায়ী নিরাময় সম্ভব নয়। এক্সরে করে আক্কেল দাঁতটির পজিশন দেখে চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নেন যে দাঁতটি স্বাভাবিকভাবে বেরোবে নাকি তা কেটে বার করতে হবে। এক্ষেত্রে এক্সরে-তে যদি দেখা যায় আক্কেল দাঁতটির অবস্থান খুবই অস্বাভাবিক ও সাধারণভাবে বের হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, অথবা যদি দেখা যায় পাশের দাঁতে ওই দাঁতটি থেকে ক্ষয়রোগ হয়েছে, তাহলে সেটা তুলে ফেলাই শ্রেয়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এর সুফল পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে লক্ষণ অনুযায়ী স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, ক্রিয়োজোট, হেক্লালাভা, চিওনামথ্যাস চেরি, প্ল্যানটাসোফো প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা যায় তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়, কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোয় ওষুধের শক্তি নির্ধারণ করে থাকেন, যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ▯

বিশ্বজুড়ে ওমিক্রন ত্রাস : কী বলছে হু

অনামিকা দে

২০২১-এর বিদায়বেলা উপস্থিত। তবে বছরশেষের উপহারের বদলে বিশ্ববাসী আরও একবার উদ্বেগজনক অজানা ভাইরাসের মুখোমুখি। ৯ নভেম্বর ২০২১ দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকার বতসোয়ানায় প্রথম শনাক্ত করা হয় যে ভাইরাসের প্রকারটি সেটিকে ২৬ নভেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি উদ্বেগজনক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই নতুন ভ্যারিয়েন্টের নাম ওমিক্রন। বলা হয়েছে, করোনা ভাইরাস যেমন ছিল সার্স— কোভিড-২ ভাইরাসের একটি ভ্যারিয়েন্ট, ওমিক্রনও তাই। এই ভাইরাস নিয়ে হু-এর টেকনিকাল অ্যাডভাইসারি গ্রুপ অন ভাইরাস কী জানাচ্ছে, কতটা সংক্রামক এই ভ্যারিয়েন্ট?

● অতি দ্রুত সংক্রমণ ছড়াতে পারে করোনার ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট। হু-এর মতে প্রাথমিক ভাবে দেখা গিয়েছে এই বারবার এই ভ্যারিয়েন্টের কবলে পড়তে পারে মানুষ। অর্থাৎ একবার সংক্রমিত হয়ে সুস্থ হবার পর পুনরায় সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা প্রবল। গবেষণা শেষ হলে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

● ডেল্টা ও করোনার অন্যান্য ভারিয়েন্টের তুলনায় ওমিক্রন এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির মধ্যে বেশি সংক্রমিত হতে পারে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয় হু-এর কাছে।

● 'ওমিক্রন'-এর উপর কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কতটা কার্যকরী অর্থাৎ কোভিড-১৯-এর ভ্যাকসিন নেওয়া ব্যক্তি ওমিক্রনের প্রকোপ থেকে কতটা সুরক্ষিত তা এখন হু-এর গবেষণাধীন।

● 'ওমিক্রন' ঠিক কতটা সংক্রামক তা এখনও অধরা কিন্তু অন্যান্য ভ্যারিয়েন্ট থেকে যে এর উপসর্গ আলাদা তা জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

● প্রাথমিক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ আফ্রিকার হাসপাতালগুলিতে রোগী ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে, তবে সেটি শুধু 'ওমিক্রন' সংক্রামিতই কিনা এখনই বলা যাচ্ছে না। আসলে এই রূপান্তরটি ঠিক কতটা সংক্রামক সেটি এখনও ঠিক বুঝতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে বলেই জানিয়েছে হু।

বিশ্বজুড়ে এখন ওমিক্রন ত্রাস। বিশ্বের ১৩টি দেশে করোনা ভাইরাসের এই নতুন প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, ইতালি, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ইজরায়েলে আক্রান্তদের শরীরে মিলেছে ওমিক্রন ভাইরাস। ফ্রান্সেও ওমিক্রন-আতঙ্ক। ১৪ দিনের আফ্রিকা সফর সেরে ফেরার পর ৮ জনের শরীরে এই ভাইরাস মিলেছে বলে ফরাসি স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে। বিশ্বজুড়ে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় সতর্ক ব্রিটেন। জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে নভেম্বরের শেষেই বৈঠকে বসছে।

এদিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি ভারতেও ওমিক্রন-শঙ্কা। মহারাষ্ট্রের ডম্বিব্যালিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত যাত্রী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য পাঠানো হলো নমুনা, কল্যাণ ডাম্বিব্যালি কর্পোরেশন জানিয়েছে। ▯

ভারতে ওমিক্রন ভাইরাসের বিপদ কতটুকু

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

আমাদের দেশে মানুষের সামনে নতুন করে যে বিপদ এসেছে সে সম্পর্কে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন, সেটি হলো করোনা ভাইরাসের নতুন রূপ— ওমিক্রন ভাইরাস। যে কোনো আরএনএ ভাইরাসের মতো করোনা ভাইরাস যা প্রাথমিকভাবে SARS-CoV-2 নামে পরিচিত, জিন মিউটেশান করে তার জিন গঠনের বিন্যাসের পরিবর্তন করে। কারণ একই গঠনের ভাইরাসগুলির স্থায়িত্বকাল খুব কম। সেজন্য এরা যখন নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে রিপ্লিকেশান বলে, তখন মাঝে মধ্যে তাদের জিন মধ্যস্থ অ্যামিনো অ্যাসিডের ট্যাগিংস্থানগুলি একে অন্যের জায়গায় চলে যায়। একেই জিন মিউটেশান বলে। এতে প্রোটিনের গঠন আলাদা হলেও প্রজাতি একই থাকে। জিন মিউটেশানে নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি করে আরএনএ ভাইরাস বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, নতুবা শুধু রিপ্লিকেশান-এ ভাইরাসের অস্তিত্বের স্থায়িত্ব আসে না। সেজন্য ভাইরাসের জিন মিউটেশান একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। একই রকম জিন বিন্যাস করতে করতে যখন নিউক্লিওটাইডের মধ্যে প্রোটিনের ট্যাগিং বিন্যাসের পরিবর্তন হয় তখন নতুন ভ্যারিয়েন্টের সৃষ্টি হয়। এতে কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রজাতির কোনো পরিবর্তন হয় না। এই ওমিক্রন ভাইরাসও তেমনি করোনা ভাইরাসের ডেলটা ভ্যারিয়েন্টের নতুন একটি রূপ।

এই ওমিক্রন ভাইরাস নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথম দেখা যায় বটসোয়ানায়। তার তিনদিন বাদে পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়। প্রায় একই সময়ে হংকঙে ওমিক্রন ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের ভাইরোলজিস্ট ডাঃ টম পিকক প্রথম এই নতুন ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের নিউক্লিওটাইডের স্পাইক প্রোটিনের সর্বাধিক মিউটেশানের কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে, এই ভ্যারিয়েন্ট 'odd cluster'-এর অর্থাৎ এটির সংক্রমণের তীব্রতা মারাত্মক রকমের নয়। তবে সমস্যাটা অন্য জায়গায়। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির প্রফেসার রবি গুপ্তা এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের জেনেটিক ইন্সটিটিউটের প্রফেসার ফ্রাঙ্কো ব্যাঁলো দুজনে পৃথকভাবে বলেন যে, এদের অ্যান্টিবডি শনাক্তকরণের ক্ষমতা rtPCR-এর মার্কারের কম থাকার কারণে এদের শনাক্তকরণ করা শক্ত। প্রফেসার ব্যাঁলো আরও বলেন, এরা সিঙ্গল বার্স্ট মিউটেশানে উদ্ভুত বলে আলফা ও ডেলটা ভ্যারিয়েন্টের মার্কারকে ফাঁকি দেওয়ার ক্ষমতা আছে। সেজন্যই মনে হয়, এখন পর্যন্ত ২৪টি দেশে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ হয়েছে জানা গেলেও কোথাও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। একমাত্র দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করার মতো রোগ যেমন এইচআইভি, ক্যান্সার ইত্যাদির উপস্থিতিতে এই রোগ মারাত্মক হতে পারে। এখনো পর্যন্ত পাওয়া খবর কিন্তু এই তথ্যকে অস্বীকার করে না।

একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান শনাক্তকরণ পরীক্ষা, rtPCR-সহ এই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টকে চিহ্নিত করতে না পারলে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা থেকেই যায়। আর সেই কারণেই হু এবং আরও কয়েকটি সংস্থা বিশ্বকে সতর্ক থাকতে বলেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও এই সতর্কতার কথাই বলেছেন। কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে দেশের বেশ কিছু সংবাদমাধ্যম নিজেদের টিআরপি বাড়ানোর দিকে লক্ষ্য

রেখে ওমিক্রন সংক্রমণ নিয়ে 'যদি' 'কিন্তু'র মোড়কে অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করছে। এমনকী একথাও বলা হচ্ছে যে, এই ভাইরাস নাকি বাজারের স্বীকৃত ভ্যাকসিনে কাবু হবে না! এমন অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কোন গবেষণাগারের পরীক্ষায় উঠে এসেছে তা জানা নেই। উপরন্তু, কোনো স্বীকৃতি গবেষণাপত্র কিন্তু এমন কথা বলছে না। বলা হচ্ছে, স্পাইক প্রোটিনে এত বেশি সংখ্যায় পরিবর্তন এবং ফ্যুরিন ক্লিভেজ এই প্রথম ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া গেল। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আরএনএ ভাইরাস প্রজাতি না পালটালে কোনো বড়ো বিপদ নেই। আর জিন মিউটেশান যত বেশি হবে, ভাইরাসের টিকে থাকার ক্ষমতা তত বাড়লেও তার বেঁচে থাকার জন্যই সে তা সংক্রমণের তীব্রতা কমিয়ে হোস্ট বডির ক্ষতি করার মাত্রা কমিয়ে দেয়। এক্ষেত্রেও একই ব্যাপারের সম্ভাবনা। যেমন SARS-CoV-2-তে প্রথম সংক্রমিত সব আক্রান্তেরই সংক্রমণের কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল। তুলনায় এখনো ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে কারো মৃত্যু হয়নি।

সংবাদমাধ্যগুলোর অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে সরকারকে বিপদে ফেলা মনে হয় একটি বড়ো উদ্দেশ্য। এখন দেশজুড়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতি পেয়েছে—যা লকডাউন পর্বে থমকে গিয়েছিল। দেশ জুড়ে পরিবহণ, শিক্ষাঙ্গন-সহ বিনোদন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড অবাধে শুরু হয়েছে। এতে সরকারের সুস্থিরতার সঙ্গে দেশের নুইয়ে পড়া অর্থনীতি আবার গতি পাচ্ছে। এই ধরনের নেতিবাচক, ভীতিপ্রদ প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যদি সরকার লকডাউন বা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আংশিক বিধিনিষেধ আরোপ করে তাহলে মানুষের সরকারের প্রতি অসন্তুষ্টি বাড়বে এবং দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। একই সঙ্গে দেশের অর্থনীতিও অসংশোধনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনীতি নুইয়ে পড়বে। এই উদ্দেশ্যে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি ও দেশ বিরোধী শক্তিগুলির মদতে এক ধরনের সংবাদমাধ্যম এই কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু করেছে। এইভাবে ভূতের ভয় দেখানোর মতো কাল্পনিক ভয় দেখানো শুরু হয়েছে।

আমাদের মনে রাখা দরকার যে, জিন মিউটেশানে নতুন ভ্যারিয়েন্ট জন্মালেও ভাইরাসের প্রজাতির পরিবর্তন হয়নি। সোজাভাবে বলতে গেলে বলা যায়, ইউরোপীয় ও এশীয় মানুষের দাম্পত্যে যে নতুন মানুষ জন্মায়, তাকে ইউরেশিয়ান বলে, যে কিনা মানুষ-গরিলা বা ওরাংওটাং নয়! আরও পরিষ্কারভাবে বলা যাক, বাজারে প্রচলিত যে সব স্বীকৃত ভ্যাকসিন আছে তাতেই করোনা ভাইরাসের একটি ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন কাবু হবে। তার কারণ, এই ভ্যাকসিনগুলি করোনা ভাইরাসের সকল ভ্যারিয়েন্টের উপরেই কার্যকরী হওয়ার মতো করে তৈরি করা হয়েছে। তর্কের খাতিরে ধরা যাক, কোনো ভ্যারিয়েন্টের সমস্ত ট্যাগিংবিন্দুগুলির জন্য কোনো ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা অনেক কমে গেল। তখন ওই ভ্যাকসিন পরিমার্জন করে নতুন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কার্যকরী করা কোনো বড়ো সমস্যা নয়। আরেকটি কথা, সমস্ত ভ্যাকিসিনকেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জন করা হয়, নাহলে তার কার্যকারিতা কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এর জন্য জনসাধারণকে ভয় দেখানো অনুচিত।

এখানে আরেকটি কথা জানানো দরকার। এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট সংক্রান্ত দুটি কাজ মনোনিবেশ করেছেন। প্রথমত, এখনো পর্যন্ত জিনম সিকোয়েন্সিং না করে ওমিক্রন সংক্রমণ নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এই পরীক্ষা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। সেজন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন যে, rtPCR টেস্টে যদি ওমিক্রন ভাইরাসের সঠিক ও নির্দিষ্ট মার্কার পাওয়া যায়। তাঁদের আশা, তাঁরা

করোনার ভ্যাকসিন ওমিক্রনে কতটা ফলদায়ক?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গবেষনায় বলছে, 'ওমিক্রন' প্রজাতির ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিনের ৩০ বার মিউটেশন হয়ে গিয়েছে। আর এই স্পাইক প্রোটিনের মাধ্যমেই ভাইরাস মানব দেহের কোষে প্রবেশ করার রাস্তা সুগম করে তোলে। আর ভ্যাকসিনের কাজ হলো স্পাইক প্রোটিনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি করে আমাদের শরীরকে ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা প্রদান করা। কিন্তু 'ওমিক্রন' প্রজাতির ক্ষেত্রে স্পাইক প্রোটিনে যেহেতু অনেকবার মিউটেশন হয়েছে তাই গবেষকরা চিন্তিত যে এর বিরুদ্ধে এই নির্দিষ্ট ভ্যাকসিন কার্যকরীভাবে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারবে কিনা।

হু-এর টেকনিকাল অ্যাডভাইসারি গ্রুপ এই বিষয়টির উপর গবেষণায় কাজ করছে।

ওমিক্রনের উপসর্গ

গলা ব্যাথা, মাথাধরা বা অতিরিক্ত ক্লান্তিভাব ও এর সঙ্গে কাশি— এই উপসর্গগুলি ওমিক্রন রুগীদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। এর সঙ্গে লক্ষণীয় হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, অক্সিজেন লেভেল কমে যাওয়া। এছাড়া স্বাদ ও গন্ধ না পাওয়া— সবই ওমিক্রনের লক্ষণ হতে পারে।

নতুন রূপ ওমিক্রন

যে কোনো আরএনএ ভাইরাসের মতো করোনা ভাইরাস যা প্রাথমিকভাবে SARS-CoV-2 নামে পরিচিত, জিন মিউটেশান করে তার জিন গঠনের বিন্যাসের পরিবর্তন করে, একই রকম জিন বিন্যাস করতে করতে যখন নিউক্লিওটাইডের মধ্যে প্রোটিনের ট্যাগিং বিন্যাসের পরিবর্তন হয় তখন নতুন ভ্যারিয়েন্টের সৃষ্টি হয়। ওমিক্রন ভাইরাসও সেইরূপ করোনা ভাইরাসের ডেলটা ভ্যারিয়েন্টের একটি নতুন রূপ।

মিউটেশান কী

একই গঠনের আরএনও ভাইরাসগুলির স্থায়িত্বকাল খুব কম। সেইজন্য এরা যখন নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে রিপ্লিকেশন বলে, তখন মাঝে মধ্যে তাদের জিন মধ্যস্থ অ্যামিনো অ্যাসিডের ট্যাগিংস্থানগুলি একে অন্যের জায়গায় চলে যায়। একেই জিন মিউটেশান বলে। এতে প্রোটিনের গঠন আলাদা হলেও প্রজাতি একই থাকে। জিন মিউটেশানে নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি করে আরএনএ ভাইরাস বেঁচে থাকার চেষ্টা করে।

অল্পদিনের মধ্যেই মার্কার পেয়ে যাবেন। তাহলে অল্প খরচে এবং দ্রুততার সঙ্গে ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীর শনাক্ত করা যাবে। দ্বিতীয় যে প্রচেষ্টা বিজ্ঞানীরা চালাচ্ছেন তা হলো, এই বিশেষ ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত রোগীর উপর স্বীকৃত ভ্যাকসিন ডেলটা ভ্যারিয়েন্টের একটি রকমফের, তার ক্ষেত্রে সফল না হওয়ার কোনো কারণ নেই। যদি সফলতার মাত্রা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, তখন ভ্যাকসিন পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে নিলেই হবে। এ কাজের জন্য সময় লাগলেও তা খুব বেশি নয়। সুতরাং 'গেল গেল' রব তোলার কোনো যুক্তি নেই।

পরিশেষে বলা যায়, এই নেগেটিভ প্রচারের জন্য ভয় না পেয়ে যথার্থ সতর্কতা অবলম্বন করলে ওমিক্রন আমাদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারবে না। সতর্কতা বলতে সমাজে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা; বাড়ির বাইরে গেলে বা বাড়ির ভেতরে বাইরের মানুষের উপস্থিতিতে যথাযথভাবে মাস্ক ব্যবহার করা; বাইরে থাকলে আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা অন্তর হাত স্যানিটাইজ করা; বাইরে থেকে নিজের বাড়িতে এসে সাবান দিয়ে ভালোভাবে স্নান করা আর বাইরের পোশাক একটি নির্দিষ্ট স্থানে আলাদা করে রেখে দেওয়া। খুব প্রয়োজনীয় হলো, সময়ে ভ্যাকসিনের ডোজ নেওয়া। আমেরিকা ও ইউরোপের বেশ কিছু দেশে শিশুদের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়েছে। আমাদের দেশের সরকারের কাছে আমার অনুরোধ যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুদের ভ্যাকসিনেশান শুরু করুন। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের এখনো অবধি যা গতি প্রকৃতি তাতে কোনো কাজ বা ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার দরকার নেই। শিক্ষাঙ্গন, বাজার-দোকান, পরিবহণ ও বিনোদন জগতের উপর এর কোনো প্রভাব পড়বে না— অবশ্যই মানুষ যদি সতর্ক থাকে। এই ধরনের প্রচারে ভুলে সরকার যদি বাধানিষেধের পথে হাঁটে তা হলে সরকার ও দেশের জনগণের সমূহ বিপদ।

(লেখক পশ্চিমবঙ্গ বায়োটেক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশানের প্রাক্তন নির্দেশক ও পরামর্শদাতা)

ওমিক্রন যত দ্রুত ছড়াচ্ছে তার ভয়াবহতা তত কমছে

ডাঃ অর্চনা মজুমদার

ওমিক্রন এক নতুন বিপদ

প্রথমেই বলে রাখি, অযথা আতঙ্কিত হবেন না, সাবধানে থাকুন, করোনার অতীতের সব সরকারি নিয়মনির্দেশিকা যেমন মাস্ক ব্যবহার, বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, ভ্যাকসিন নেওয়া, কেন্দ্রীয় সরকারের ওমিক্রন সংক্রান্ত নির্দেশিকা মেনে চলুন। কেন্দ্রীয় সরকার অতীতের মতো এই করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন নিয়ে যথেষ্ট সজাগ, সচেতন এবং দেশবাসীর স্বার্থে যা যা করণীয় তাই করবেন এই বিশ্বাস আমার আপনার সকলের আছে।

ওমিক্রন কী?

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম খোঁজ মেলে বি. ১.১৫২৯ ভ্যারিয়েন্টের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে ভ্যারিয়েন্টের নাম দেওয়া হয় ওমিক্রন। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এই নতুন ভ্যারিয়েন্টের স্পাইক প্রোটিনে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৫০ বার অভিযোজন বা মিউটেশান হওয়ায়, ডেলটা ভ্যারিয়েন্টের থেকেও বেশি শক্তিশালী ও অতি সংক্রামক হতে পারে তাই এটিকে 'উদ্বেগের কারণ' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভারতেও করোনার নতুন প্রজাতি ওমিক্রনের কয়েকটি কেস পাওয়া গেছে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের মাধ্যমে। এই মুহূর্তে বিভিন্ন সংবাদপত্রের তথ্য অনুযায়ী ৪০টি দেশে ৩৭৩ জন ওমিক্রন-সংক্রমিত বলে জানা গেছে।

ওমিক্রনে কী কী উপসর্গ?

যেহেতু এটি করোনারই একটি মিউটেটেড রূপ তাই করোনার মতোই এর একই উপসর্গ। জ্বর, সর্দি, গা-হাত ব্যথা, দুর্বলতা, স্বাদ, গন্ধহীনতা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি অথবা উপসর্গহীন।

ভাইরাসের মিউটেশান (করোনা ভাইরাস-সহ কোভিড-১৯ মহামারী সৃষ্টি করে) নতুন বা অপ্রত্যাশিত নয়, সমস্ত আরএনএ ভাইরাসই সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এটি আরএনএ ভাইরাসের প্রকৃতি যেমন করোনা ভাইরাস ধীরে ধীরে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়। ভাইরাসের রূপান্তর ঘটে যখন কোনও ভাইরাসের জিনে কোনো পরিবর্তন বা মিউটেশান হয়, ভৌগোলিক বিচ্ছেদের ফলে জিনগত ভাবে স্বতন্ত্র রূপগুলি দেখা দেয়। ওমিক্রনের প্রচুর মিউটেশান রয়েছে যা সম্ভবত ভাইরাসটি কত সহজে বা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তা নির্ধারিত করবে। যাইহোক, ওমিক্রন সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানি না, জানতে হবে ভাইরাসটি আরও সংক্রমণযোগ্য হতে পারে বা এটি খারাপ ফলাফলের কারণ হতে পারে কিনা!

আমরা শুধু এইটুকু জানি যে, ওমিক্রনের

ফঃ ৪

প্রচুর মিউটেশান রয়েছে যা সম্ভবত ভাইরাসটি কত সহজে বা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তা নির্ধারণ করবে। কিন্তু আমরা জানি না ভাইরাসটি আরও কতটা সংক্রমিত হতে পারে। ওমিক্রন আরও গুরুতর রোগের মতো খারাপ ফলাফল ঘটায় কিনা তাও আমরা জানি না। যতদিন করোনা ভাইরাস জনসংখ্যার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়বে, ততদিন মিউটেশান ঘটতে থাকবে এবং ডেলটার বিকল্প পরিবার বিকশিত হতে থাকবে। বর্তমানে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে কোভিড-১৯-এর ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে যুক্ত লক্ষণগুলি অন্যান্য রূপের তুলনায় ভিন্ন বা বেশি গুরুতর অথবা বর্তমান ভ্যাকসিন এবং থেরাপিউটিকগুলি নতুন রূপের বিরুদ্ধে অকার্যকর হবে।

হু ইতিমধ্যেই আশাবাদী। তারা বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে ওমিক্রনের প্রভাবগুলি হালকা হতে পারে। ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের তীব্রতার মাত্রা বোঝার জন্য কয়েকদিন থেকে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে, বর্তমানে এমন কোনো তথ্য নেই যে ওমিক্রনের সঙ্গে যুক্ত লক্ষণগুলি অন্যান্য রূপগুলির থেকে আলাদা। একটি ইতিবাচক খবর হলো যে বর্তমান SARS-CoV-2 PCR ডায়াগনস্টিকগুলি এই ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টটি শনাক্ত করতে চলেছে।

কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে, SARS-CoV-2 করোনা ভাইরাস যা কোভিড-১৯ ঘটায় তা পরিবর্তিত হয়েছে, যার ফলে ভাইরাসের বিভিন্ন রূপ রয়েছে। এর মধ্যে একটিকে ডেলটা রূপ বলা হয় (প্যাঙ্গো বংশ বি. ১.৬১৭.২ থেকে উদ্ভূত)। ডেলটা করোনা ভাইরাসকে ডব্লিউএইচও এবং সিডিসি দ্বারা 'উদ্বেগের ভ্যারিয়েন্ট' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি একজন থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে আরও সহজে ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে হয়। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, ডেলটাকে এখন পর্যন্ত SARS-CoV-2 করোনা ভাইরাসের সবচেয়ে সংক্রমক রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ওমিক্রনের মারণ ক্ষমতা

ওমিক্রনের সংক্রমণের হার অতি দ্রুত হলেও মারণ ক্ষমতা কম বলেই বিশেষজ্ঞমহলের ধারণা। তবে এই নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা চলছে, তবে এটা সত্যি অন্যান্য আরএনএ ভাইরাসের মতোই এই করোনা ভাইরাস যত দ্রুত মিউটেটেড হচ্ছে তত তার ভয়াবহতাও কমছে।

ওমিক্রনে ভ্যাকসিন কতটা কার্যকরী

ভ্যাকসিন নিলেই আমার করোনা হবে না এটা ভুল ধারণা। ভ্যাকসিন আমাদের শরীরের করোনা প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় যার ফলে রোগী করোনা আক্রান্ত হলেও তার ভয়াবহতা অনেক কম থাকে। তাই ভ্যাকসিন নেওয়ার পরেও করোনার প্রটোকল মানতে বলা হয়।

এবার আসি কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিনের বিষয়ে। ICMR-এর এপিডেমিওলজি এবং সংক্রামক রোগ বিভাগের প্রধান ডাঃ সমীরণ পণ্ডা একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কোভিডের বিরুদ্ধে mRNA ভ্যাকসিনগুলি ওমিক্রনের বিরুদ্ধে কার্যকর নাও হতে পারে। mRNA ভ্যাকসিনগুলি ইতিমধ্যেই পরীক্ষিত। এইসব

ভ্যাকসিনের আরও উন্নয়ন দরকার। তবে সব টিকা একই রকম নয়। কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন আমাদের সিস্টেমে একটি ভিন্ন অ্যান্টিজেন উপস্থাপনের মাধ্যমে কাজ তৈরি করে। যার ফলে এই ওমিক্রনেও আমাদের ভ্যাকসিন আমাদের সুরক্ষা দেবে বলেই বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন। তাই ভয় সংকোচ দূর করে সকলে ভ্যাকসিন নিন।

কেন্দ্রীয় সরকারি পদক্ষেপ

কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে দেশবাসীকে ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রয়াস করে গেছে তা সারা পৃথিবীর কাছে তা এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। গত ৭০ বছরের ভগ্ন স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যেভাবে তুলে ধরেছেন তা সে গত ৭০ বছরের সরকারের ৪৮০০০ ভেন্টিলেটারকে দ্বিগুণ করা থেকে সব সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো পর্যন্ত তার নিদর্শন ভারতের আর আছে বলে মনে হয় না। করোনার বিষয়ে ২০২০ সালের শুরুতে আমরা যে অবস্থানে ছিলাম তার চেয়ে আজ আমরা অনেক ভালো অবস্থানে আছি। আমাদের সরঞ্জাম আছে, আমাদের ডায়াগনস্টিক আছে, আমাদের ওষুধ আছে, আমাদের ভ্যাকসিন আছে এবং আমরা জানি কী করে করোনার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

ওমিক্রন নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং আন্তর্জাতিক বিমান চলাচলের প্রসঙ্গে কেন্দ্রের নিয়ম শিথিল করার যে পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলিকে পুনর্বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই যে দেশগুলিতে ওমিক্রনের খোঁজ মিলেছে, তাদের 'ঝুঁকিপূর্ণ' দেশ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই দেশগুলি থেকে আগত যাত্রীদের উপর কড়া নজরদারি রাখারও নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট থেকে দেশকে রক্ষা করতে কঠোর কন্টেনমেন্ট, সর্বদা নজরদারি, করোনা টিকাকরণের হার বৃদ্ধি, করোনা পরীক্ষার হার বৃদ্ধি, দ্রুত জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের জন্য নমুনা পাঠানো ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখার সঙ্গে করোনাবিধি অনুসরণ করে চলার নির্দেশিকাও দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি রাজ্যকে আক্রান্তের হার বা পজেটিভিটি রেট যাতে ৫ শতাংশের কম থাকে, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরটি-পিসিআর পরীক্ষা দ্রুত চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে বলেই জানানো হয়েছে।

(লেখিকা বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং সমাজকর্মী)

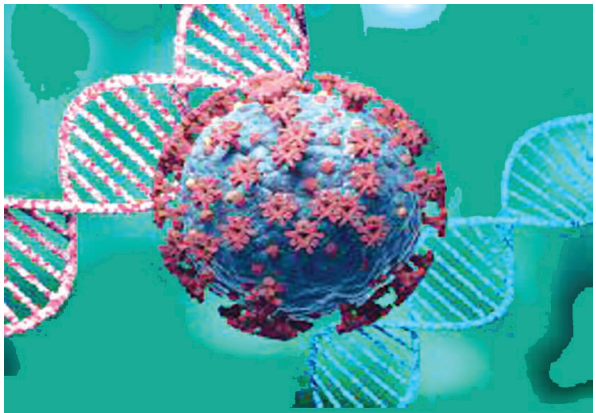

ওমিক্রন নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ

শেষ খবর পাওয়া অনুযায়ী ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ডিটেক্ট করা হয়েছে দিল্লি, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যে। এই মুহূর্তে ওমিক্রন ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২১ ছাড়িয়েছে। এখনও পর্যন্ত বিশ্বের ৪০টি দেশে ওমিক্রন ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেলেও কোনো রোগীর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

কোভিড-১৯-এর নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন নিয়ে বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত না হয়ে প্রস্তুত থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শীর্ষ বিজ্ঞানী সৌম্যা স্বামীনাথন। ৩ ডিসেম্বরে একটি সম্মেলনে স্বামীনাথন দক্ষিণ আফ্রিকার তথ্যবিচারের ভিত্তিতে ওমিক্রনকে 'অতি সংক্রামক' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, ভ্যারিয়েন্টটি সম্ভবত বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের অন্যসব ভ্যারিয়েন্টকে হটিয়ে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করবে, যদিও এই বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা কঠিন। কিন্তু আমাদের আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে হবে।'

‘ওমিক্রন নিয়ে এখনই আতঙ্কিত হবার কোনও কারণ নেই’

(ডাঃ ইন্দ্রনীল খান বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ এবং জনস্বাস্থ্য কর্মী। সম্প্রতি তাঁর একটি গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন গঠিত হয়েছে। লেখক মিশনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। স্বস্তিকার পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন অনামিকা দে।)

প্র: ভারতবর্ষে বর্তমানে করোনা ভাইরাসের পরিস্থিতি কী?

উ: করোনা ভাইরাস এসেছে ২০১৯ সালে। এই দু’বছর করোনা মানবদেহের সারকুলেশানে রয়েছে। ভাইরাস যত বেশি মানুষের শরীরে থাকবে তত মিউটেশান ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে। প্রথমে সেটা ছিল আলফা ভ্যারিয়েন্ট অব করোনা যেটা ডিটেক্টেড হয়েছিল চীনের উহানে, তারপর করোনার সেকেন্ড ওয়েভে আমরা দেখেছি ডেলটা ভ্যারিয়েন্ট যেটা ‘ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন’ ছিল এবং যা খুবই সংক্রামক। ডেলটার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে ব্যক্তির একবার করোনা হয়েছে সে আবারও সংক্রমিত হয়েছে, যেটা চিন্তার বিষয়। এটিকে বলা হয় হয় ইমিউনোস্কেপিস্ট। ডেলটার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির থেকে আরেকজন ব্যক্তিতে সংক্রমণ ছড়াচ্ছিল বেশি। আলফা ভাইরাসের ক্ষেত্রে একজন থেকে যদি তিনে ছড়ায়, ডেলটার ক্ষেত্রে একজন থেকে ছয়-সাতে ছড়াচ্ছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বুঝতে পারেনি যে সংক্রমিতের সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি পাবে দ্বিতীয় ঢেউয়ে। তবে লক্ষণীয় বিষয়, এর পরের সময়টাতে পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুজোর সময় আমরা ভেবেছিলাম তৃতীয় ঢেউ আসবে এবং উৎসবের মরসুমে লোকসমাগম বেশি হওয়ার ফলে সংক্রমিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু তা হয়নি।

প্র: কিন্তু গত মাসে আবার নতুন একটি করোনার ভ্যারিয়েন্ট এসেছে যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ‘ভ্যারিয়েন্ট অব কনসার্ন’ বলছে। এই নতুন ভ্যারিয়েন্টটি হলো ‘ওমিক্রন’। এই ওমিক্রন ভাইরাসটি কীভাবে ধরা পড়ল এবং এটি কতটা ভয়ংকর হতে পারে?

উ: গত মাসের আপডেট অনুযায়ী করোনা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছিল কিন্তু বর্তমানে আবার একটি চিন্তার বিষয় শুরু হয়েছে। গত মাসে সাউথ আফিকার বটসোয়ানায় তিনদিনে সংক্রমিতের সংখ্যা ডবল হয়েছে এবং সাতদিনে সেটি তিনগুণ বেড়ে গেছে। হঠাৎ করে বাড়ছে দেখে বৈজ্ঞানিক মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এটি আলফা, ডেলটা কোনওটি নয়। নতুন ভ্যারিয়েন্ট ২৪ নভেম্বর ২০২১-এ যার নামকরণ হয়েছে ‘ওমিক্রন’। এর মিউটেশান অনেক বেশি, ডেলটার থেকেও বেশি। এই নিয়েই এখন বিশ্বব্যাপী গবেষণা চলছে। বিভিন্ন দেশ থেকে তথ্য নিয়ে ‘হু’ এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছে। এই ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্টেটি খুবই সংক্রমক, তাই দ্রুত সংক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এখনও মৃত্যুহার বেশি না হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি আছে। তবে বেশ কিছু দেশ ইতিমধ্যেই সতর্কতা অবলম্বন করছে। দূরপাল্লার ফ্লাইটগুলো বাতিল করেছে। ভারত-সহ অন্যান্য দেশ বাইরে থেকে আসা ফ্লাইটের যাত্রীদের rtPCR টেস্ট করিয়ে নিচ্ছে এবং তাদের সাতদিন বা চৌদ্দদিনের আইসোলেশানে রাখা হচ্ছে।

প্র: করোনার ভ্যাকসিন কি ‘ওমিক্রন’-এ কাজ করবে? যারা ডবল ডোজ ভ্যাকসিন নিয়েছেন তারাও কি নিরাপদ নয়?

উ: যেসব ব্যক্তির দেহে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গিয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তারা ক’টা ভ্যাকসিন নিয়েছে বা আদৌ নিয়েছে কিনা। ওমিক্রণের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন কাজ করবে কিনা এই বিষয়টি গবেষণাধীন, তবে একেবারেই কাজ করবে না এটিও বলা যাচ্ছে না। তবে এটি হাইলি সিউটেটেড স্টেন কিন্তু মর্টালিটি রেট যে বেশি সে তথ্য কিন্তু পাওয়া যায়নি।

তবে ভ্যাকসিন নেওয়ার পর কোনো ব্যক্তির শরীরের অ্যান্টিবডি এই নতুন মিউটেটেড অ্যান্টিজেনকে কাবু করতে পারবে কিনা সেটিই এখন দেখবার বিষয়। এই বিষয়টি নিয়ে এখন বিজ্ঞানী মহলে সবচেয়ে বেশি গবেষণা হচ্ছে। ডবল ডোজ ভ্যাকসিন নিয়ে মানুষ কতটা নিরাপদ সেই বিষয়টিও দেখা হচ্ছে।

প্র: সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ভীতি সঞ্চারিত হচ্ছে ওমিক্রন নিয়ে। সতর্কতা হিসেবে এখন কী করণীয়?

উ: ওমিক্রন-কে রুখতে গেলে করোনাকালের মতো সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক, স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে। সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেন্টেন করতে হবে এবং অবশ্যই যাদের ভ্যাকসিনেশান এখনও হয়নি তাদের তৎপর হয়ে সেটি কমপ্লিট করতে হবে। তবে অযথা প্যানিক করবেন না। এখনও সেভাবে অতিরিক্ত চিন্তার কোনো বিষয় সামনে আসেনি। ■

মহাকবি কালিদাসের মৃত্যুরহস্য

ড. অশোক দাস

চারশো তিরিশ খ্রিস্টাব্দ। ভারতবর্ষের এক গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণময় যুগ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের পর উজ্জয়িনী জয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বনামধন্য পুত্র কুমারগুপ্ত এক আনন্দ উৎসবের আয়োজন করেন। বিক্রমাদিত্যের মতো কুমারগুপ্তের বিজয়বার্তাও তখন ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-দেশান্তরে। অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত রাজধানী বারাণসী। সেই সঙ্গে অপূর্ব সুসজ্জায় সজ্জিত পুরাতন রাজপ্রসাদ পাটলীপুত্র। রাত-দিন প্রহরারত সশস্ত্র সৈনিক। একদিন প্রভাতে খনা ও মিহির উপস্থিত হলেন পাটলীপুত্রের রাজপুরীর দ্বারদেশে। দ্বাররক্ষক খনাকে রাজপুরীতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন কিন্তু মিহিরকে থাকার নির্দেশ দিলেন কালিদাসের বাসস্থান কালীমন্দিরে। সেই সময় কুমারগুপ্ত পণ্ডিতদের নিয়ে উজ্জয়িনীতে কর্মরত। মহারানির নির্দেশে কালিদাসকে ডেকে পাঠালেন পাটলীপুত্রে। মহারানি নবাগত অতিথি খনার আচার ব্যবহার কথাবার্তায় বিমুগ্ধ হলেন। মহারানি পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় খনা বললেন— আমি মালব দেশের বারুইরাজের কন্যা। সিংহলের বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছি। খবর পেয়েছি এখানে জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিতদের পুরস্কৃত করা হবে, কিন্তু আমরা অযাচিত অতিথি। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে দুটি পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি আপনার সভার শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বরাহ পণ্ডিতের পুত্রবধূ। পিতৃদেবের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি নিজপুত্রকে গ্রহণ করতে রাজি হননি। রানিমা শুনে স্তম্ভিত হলেন। প্রশ্ন করলেন, বরাহ পণ্ডিতের কোনো পুত্রসন্তান নেই। পুত্রবধূ বলে কী করে পরিচয় দিচ্ছ? খনা বললেন, সেই ঘটনা বলার জন্য এখানে আসা। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পিতৃদেব বঙ্গদেশে ভাগীরথী নদীতে বিশাল এক তাম্রপাত্র ভাসতে দেখেন। তাম্রপাত্রটি তুলে নিয়ে এসে দেখেন এক নবজাত শিশু। তাম্রপাত্রটির মধ্যে তালপাতায় লেখা ছিল শিশুটির জন্মকুণ্ডলী। পিতার নাম বরাহ পণ্ডিত, মাতার নাম ধারাদেবী। এই বলে তালপাতায় লেখা জন্মকুণ্ডলীটি রানিমার হাতে দিলেন। কয়েকদিন পরে পণ্ডিত কালিদাস মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করলেন রানিমার কক্ষে। মহারানি মিহিরকে দেখে অবাক। মিহির মহারানিকে প্রণাম করায় রানিমা বললেন, 'তোমাদের জীবনযাত্রা শুভ হোক'!

মহারানি বেশ কিছু সময় তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন— ঠিক তিরিশ বছর আগে বরাহ পণ্ডিতকে যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমনি চেহারা, গলায় রুদ্রাক্ষর মালা, সেইরকমই উপবীত, কপালে সেই রকম তিলক, ঠিক সেই রকমই গেরুয়া বসন। এমন সময়ে খনা সেখানে উপস্থিত হওয়ায় মিহির কালিদাসকে বলল, 'ইনি আমার সহধর্মিণী খনা। এখন শ্রীলঙ্কার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ও গবেষক। আপনি যে কোনো প্রশ্ন করুন ইনি গণনা করে সঠিক উত্তর দেবেন।' মহারানি প্রশ্ন করলেন— আগামী বৃহস্পতিবার ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদরা আসবেন। কতজন পণ্ডিত এই রাজসভায় উপস্থিত হবেন? খনা কিছু সময় নীরব থেকে বলল, 'আহারান্তে দেখবেন বারশো তেরোজন'। মহারানি বললেন— যদি এই ঘটনা সত্য হয় আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বলে ঘোষণা করব। মহাকবি কালিদাস রানিমাকে বললেন— রাজসভায় কোনো মহিলার যোগদানের রীতি নেই। রানিমা বললেন— আমি ঘোষণা করছি আজ থেকে যে কোনো মহিলা পণ্ডিতদের সভায় যোগদান করতে পারবে। তুমি এদের নিয়ে উজ্জয়িনীতে জ্যোতির্বিদদের আলোচনা সভায় যোগদানের ব্যবস্থা করো। গোপনে রানিমা পণ্ডিতমশায়কে বললেন— এদের বক্তব্য খোঁজ নিয়ে দেখা হোক। পণ্ডিতমশায় বললেন— মিহিরের কাছ থেকে ঘটনাটি শুনেছি। আমাদের রাজপণ্ডিত ভৃগু জ্যোতিষার্ণবকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য মালব, বঙ্গদেশ ও শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়েছি,খনার পিতৃদেবকেও এই সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছি।

এই বলে রানিমাকে জানালেন— বঙ্গদেশের রাজপণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে জানলাম— আজ থেকে তিরিশ বছর আগে বঙ্গদেশে ঘূর্ণি ঝড় ও প্লাবনে দেখা দিয়ে ছিল মহামারী। বঙ্গরাজ ছিলেন বৌদ্ধ

ধর্মাবলম্বী। বেদ-বেদান্ত যাগযজ্ঞের চর্চা লোপ পায়। দেখা দেয় অরাজকতা। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে চলতে থাকল মৃত্যু মিছিল। মাঠে ঘাটে নদীতে অসংখ্য গোরু-ছাগল-কুকুরের গলা পচা মৃতদেহের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে সারাদেশে দেখা দিল মহামারী। পণ্ডিতদের বিশ্বাস, মুনিঋষিরা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি বিচার বিশ্লেষণ করে যা বলতেন তাই ঘটত। বঙ্গ রাজাদের আকুল আবেদনে রাজপণ্ডিত বারুইরাজও গিয়েছিলেন বঙ্গদেশে। বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ পণ্ডিতদের পছন্দ অনুসারে বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন ভাগীরথীর তীরে নবদ্বীপ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি এলাকায় জমিদারদের বাড়িতে। পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে আরম্ভ হলো যাগযজ্ঞ। এই সময় বরাহ পণ্ডিতের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। গ্রহ নক্ষত্র বিচার করে দেখলেন পরমায়ু একশো বছর। লেখার সময় জাতপত্রে ভুল করে লিখলেন দশ। পরে একদিন জাতপত্রটি পড়তে গিয়ে চমকে উঠলেন। পরমায়ু মাত্র দশ বছর। মুনি ঋষিদেরও মতিভ্রম হয়ে থাকে। সেইরূপ মতিভ্রম হলো বরাহ পণ্ডিতের। তিনি ভাবলেন দশ বছর লালন পালনের পর শিশুটির যখন গভীর ভালোবাসায় ভরে উঠবে তখন মৃত্যু হলে অত্যন্ত শোকবিহ্বল হতে হবে। তাই তিনি ঠিক করলেন পুত্রকে পবিত্র গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবেন।

একদিন পত্নীর অবর্তমানে শুভলগ্ন শুভতিথিতে বিশাল একটি তাম্রপাত্রে পুত্র মিহিরকে ফুলচন্দনে সাজিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে বাসস্থানে ফিরে গেলেন। ঠিক সেই সময় পণ্ডিত বারুইরাজ যাচ্ছিলেন ওই পথ দিয়ে। বারুইরাজ নদীতে তাম্রপাত্রটি ভাসতে দেখে শিষ্যদের বললেন, তাম্রপাত্রটি নদী থেকে তুলে আনতে। তাম্রপাত্রটি পণ্ডিতমশায় দেখে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন এক অপূর্ব সুন্দর দেবশিশু। চতুর্দিকে লক্ষ্য করলেন জনমানবশূন্য। তিনি বাসস্থানে ফিরে সহধর্মিণীকে বললেন— বহুদিন ধরে ঈশ্বরের কাছে সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলে, তাই গঙ্গাদেবী সন্তুষ্ট হয়ে এই শিশু সন্তানকে উপহার দিয়েছে তোমাকে। কী অপূর্ব সুন্দর শিশু। নিজ সন্তানের মতো লালন পালন করতে লাগলেন বারুইরাজ। বরাহ পণ্ডিত বাসস্থানে ফিরে এসে দেখলেন— সহধর্মিণী আকুল কান্নায় মুর্হুমুহু মূর্ছা যাচ্ছেন। প্রতিবেশী মহিলাদের নিয়ে ছুটে গেলেন ভাগীরথীর তীরে। সকলেই দেখলেন কোথাও খুঁজে পেলেন না তাম্রপাত্রটি। সকলের বিশ্বাস মিহির ভাগীরথীর জলে ডুবে গেছে। মিহির আর ইহজগতে নেই! ধীরে ধীরে দূরীভূত হলো মহামারী। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হয়ে উঠল বঙ্গদেশ। বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বিপুল উপঢৌকন নিয়ে ফিরে গেলেন নিজ নিজ বাসস্থানে। বরাহ পণ্ডিতের সহধর্মিণীর আকুল কান্না দেখে এক মাতৃহারা শিশুকে দত্তক গ্রহণ করেন। তার নাম রাখেন মিহির। শ্রীলঙ্কার রাজপরিবার থেকে যে তথ্য পেয়েছি তা বলছি শুনুন, 'শ্রীলঙ্কার সুমহান রাজা কুমারদাস। এই সময় শ্রীলঙ্কায় শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চায় বিশ্ববিদ্যালয়টির যেমনি সুনাম সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি জ্যোতিষচর্চায় ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে নিয়েছে। কুমারদাসের রাজবাড়ির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন বারুইরাজ। এই পণ্ডিত বারুইরাজ এক সময় একটি শিশু বঙ্গদেশ থেকে কুড়িয়ে অনেন। পরে তাঁর এক কন্যা জন্মলাভ করে। তার নাম রাখেন খনা। বারুই রাজকন্যা জন্মলগ্নের গ্রহ-নক্ষত্র বিচার করে দেখলেন অল্পায়ু, কন্যা ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীতে এসেছে। তাই কন্যার নাম রাখেন ক্ষণা বা খনা। মিহির ও খনা একই সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেদ বেদান্ত জ্যোতিষচর্চায় গভীর ভাবে জ্ঞান অর্জন করে।

একদিন শুভলগ্ন শুভ তিথিতে খনা ও মিহিরের বিয়ে হয়। বিয়ের পর খনা ও মিহির জন্মস্থানে ফিরে যেতে চায়। পণ্ডিত বারুইরাজ মহানন্দে খবরটি জানায় বরাহ পণ্ডিতকে। কিন্তু বরাহ পণ্ডিত তাঁর ছেলে যে জীবিত তা তিনি অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয় পণ্ডিত বারুইরাজকে চরম অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। শ্রীলঙ্কার সেনাপতি অমর সিংহ বহুদিন থেকে খনার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন, কিন্তু পণ্ডিতবারুইরাজ এই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় অমর সিংহ মিহিরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। বারুইরাজ পণ্ডিতের সহধর্মিণী গোপনে খনা ও মিহিরকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দেন। কুমারদাস আপনার কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন— ভারতবর্ষে আপনার রাজ্যে খনা ও মিহির যেন ঠাঁই পায়। আনন্দ উৎসবে মুখরিত উজ্জয়িনীতে সারারাত্রি চলছে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান। ভারত সম্রাট কুমার গুপ্ত ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘোষণা করলেন, 'আজ জ্যোতির্বিদদের আলোচনা সভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করবেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গায়িকা বিদ্যাবতী'। বিদ্যাবতী বীণা যন্ত্রটি হাতে নিয়ে প্রবেশ করলেন সভাকক্ষে, যেন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন স্বয়ং সরস্বতী। অপূর্ব সুরে গান ধরলেন :

মানব কল্যাণে এসো ধরাধামে পূর্ণ জ্যোতির্ময়।
জ্ঞানের আলোক বিকশিত হোক সারাটা বিশ্বময়।
আর্য ঋষির স্বপ্ন সাধনা
প্রতি গৃহে গৃহে করি আরাধনা
মহানন্দে ভরিয়া উঠুক দাও আজি বরাভয়
মানব কল্যাণে এসো ধরাধামে পূর্ণজ্যোতির্ময়।
ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টি করিতে এসো তুমি বারে বারে
যেমন করিয়া এসেছিলে তুমি কংসের কারাগারে।
অসীম আকাশে অগণিত তারা,
কোথায় চলছে যেন দিশেহারা,
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ধারায় তোমার আলোক বিশ্বময়
মানব কল্যাণে এসো ধরাধামে পূর্ণ জ্যোতির্ময়!

সভায় মহাকবি কালিদাস ঘোষণা করলেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের নাম ছিল অজনাভ দেশ। ঋষভদেবের পুত্র ভরত ছিলেন সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের উপাসক, সর্ব গুণাকর। তাই তাঁরই নামানুসারে দেশটির নামকরণ হয়েছে ভারতবর্ষ। অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র, দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বুদ্ধিমান ধার্মিক প্রজাবৎসল রাজা। ঠিক তেমনি মহান আদর্শ চরিত্রবান ভারত সম্রাট কুমারগুপ্ত। তিনি রাজ্য পরিচালনায় স্বর্ণময় যুগের সৃষ্টি করেছেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। বর্তমান শিল্পে সাহিত্যে দর্শনে প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছে নবরত্ন পণ্ডিত মণ্ডলীর

সুদক্ষ পরিচালনায়, কিন্তু নবরত্ন সভার শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বরাহ পণ্ডিত বহু বছর ধরে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বর্তমান তিনি বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, তাই রাজসভা থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করছেন।

আজ এই সভায় যিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে বিবেচিত হবেন তাকে আমরা এই রাজসভায় জ্যোতিষশাস্ত্রের শূন্য আসনটিতে বসবার আহ্বান জানাব। এমন সময় মহারানি খনা ও মিহিরকে সঙ্গে নিয়ে রাজসভায় প্রবেশ করলেন। মহারানি বললেন, 'জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের জানাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ। আজ আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, পণ্ডিতদের আলোচনা সভায় মহিলারাও যোগদান করতে পারবেন। মণি, মুক্তা, স্বর্ণের দেশ শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কার রাজা কুমার দাস দুটি মহামূল্য উপহার পাঠিয়েছেন'। মহারানি ইঙ্গিত করায় খনা ও মিহির দাঁড়িয়ে সভাসদদের প্রণতি জানালে সভাসদরা খনা ও মিহিরকে জানাল সাধুবাদ। মহারানি বললেন— আমার কয়েকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর যিনি দেবেন তাঁকে জ্যোতির্বিদের শূন্য আসনটিতে বসার আহ্বান জানাব। আমার প্রথম প্রশ্ন— 'আজ থেকে তিরিশ বছর আগে মীনলগ্নে বৃষরাশিতে মৃগশিরা নক্ষত্রে পূর্ণিমা তিথিতে একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল, তার ভাগ্যে কী ঘটনা ঘটতে পারে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই পণ্ডিতসভায় কতজন পণ্ডিত উপস্থিত হবেন'? বরাহ পণ্ডিত বললেন— এই প্রশ্ন আমাকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখন আমার স্মরণ হয়েছে— আমি আমার পুত্রের জন্মতিথি নক্ষত্র গণনা করে দেখেছিলাম তার পরমায়ু দশ বছর। আমার গণনা অভ্রান্ত। খনা ও মিহির তালপাতায় লেখা জন্মকুণ্ডলীটি শ্রেষ্ঠ বিচারক মহাকবি কালিদাসের হাতে দেওয়ায়, কালিদাস জন্মকুণ্ডলীটি বরাহ পণ্ডিতকে দিয়ে বললেন— পুনরায় বিচার করে দেখুন, এটি সঠিক গণনা হয়েছে কিনা? বরাহ পণ্ডিত বললেন, হ্যাঁ এটি আমারই হাতের লেখা। এটি আমার নির্ভুল গণনা। খনা বললেন— 'কীসের তিথি কীসের বার, তিথি নক্ষত্র দিয়ে সার, কী করেন শ্বশুর মতিহীন, পলকে আয়ু বারো দিন'। সমস্ত পণ্ডিত হিসেব করে দেখলেন মিহিরের পরমায়ু একশো বছর। দম্ভক পুত্র মিহির তীব্র প্রতিবাদ জানাল— এই সকল পণ্ডিত ছলচাতুরী করে শ্রীলঙ্কা থেকে এসেছেন। আপনাদের জানা আছে রাবণ ছলচাতুরী করে সীতাদেবীকে চুরি করেছিলেন। সেভাবেই আমার পিতৃদেবের বিষয় সম্পত্তির লোভে এরা এদেশে এসেছেন। এদের মধ্যে নিশ্চয়ই কূট অভিসন্ধি রয়েছে। এদেরকে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক!

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতমণ্ডলী জানালেন— এটি উৎকট অবাস্তব প্রশ্ন। খনা বলল— বারোশো তেরোজন। এমন সময় সভামধ্যে হইচই বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় মহারানি বললেন— বরাহজী! বৃদ্ধ হলে হিংসা ক্রোধ মোহ মাৎসর্য দেহে বাঁসা বাঁধে। আপনি এই রাজসভার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পণ্ডিত। আপনার গণনা বহু বছর দেখে আসছি অভ্রান্ত। আপনি ধৈর্যচ্যুত হবেন না। মহারানি এই সভার শ্রেষ্ঠ বিচারক পণ্ডিত কালিদাসকে বললেন, 'পণ্ডিতজী আপনি সমস্ত ঘটনা শুনলেন,— এরপর কী করণীয়'। মহাপণ্ডিত কালিদাস বললেন— আহারের ঘণ্টা বেজে গেছে। এখন সকলে চলুন— আহারান্তে আলোচনা হবে। বরাহ পণ্ডিতকে বললেন— আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমি যা বলব আপনার মঙ্গলের জন্য বলব। এখন সকলে চলুন আহারে। আহারান্তে বার বার গণনা করে দেখা হলো পণ্ডিত উপস্থিত হয়েছেন বারোশো বারোজন। মহারানি বললেন খনা তোমার গণনা ভুল। উত্তরে খনা বলল— ভালো করে গণনা করে দেখুন, এই পণ্ডিত মণ্ডলীতে একজন কাপালিক ছদ্মবেশে রয়েছেন। ওই কাপালিকের কাছে একটি শিশু রয়েছে। ওই শিশুটির বয়স ছয় বছর। শিশুটির এক চোখ অন্ধ। প্রহরীরা ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখলেন— হ্যাঁ, এক পণ্ডিতের ঝোলাতে শিশু রয়েছে। শিশুটির এক চোখ অন্ধ। কাপালিককে রানিমার কাছে আনা হলে, কাপালিককে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। জানিয়ে দিলেন, 'এই রাজ্যে কোনো নরহত্যা চলবে না'।

রানিমা সভায় ঘোষণা করলেন— এই সভায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত খনা ও মিহির। মহাকবি কালিদাস সভায় দাঁড়িয়ে বললেন— মহারানি আমার উপর বিচারের যে দায়িত্বভার দিয়েছেন তা সঠিক বিচার বিশ্লেষণ করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিচারের ভার আমি এমন একজন জ্ঞানী বিচক্ষণ মানুষের হাতে তুলে দিতে চাই। তিনি যা বলবেন পণ্ডিত সমাজ নিশ্চয়ই তা মেনে নেবেন। এমন সময় সভাকক্ষে ভৃগু জ্যোতিষার্ণব পণ্ডিত বরাহের সহধর্মিণী ধারাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। মহাকবি কালিদাস বিচারকের আসনে বসালেন ধারাদেবীকে। কালিদাস প্রশ্ন করলেন— আজ থেকে তিরিশ বছর আগে আপনার একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল? গঙ্গাগর্ভে তাকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়? এখন এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আপনার সন্তান রয়েছে কি? আপনি ঈশ্বরকে সাক্ষ্য রেখে সত্য কথা বলবেন। ভৃগু জ্যোতিষার্ণবকে বললেন, 'ধারাদেবীকে এক একজন পণ্ডিতের কাছে নিয়ে যান। ধারাদেবী ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, কিন্তু কোনো পণ্ডিতকেই পুত্র বলে চিহ্নিত করলেন না। সর্বশেষে রানিমার পাশে বসেছিলেন মিহির। মিহিরকে দেখে বললেন— হ্যাঁ এই আমার সেই শিশু! এই তো কপালে সেই তিল, ঠোঁটে সেই তিল। হ্যাঁ, এই আমার সেই শিশু! মহাকবি বললেন— ধারাদেবী! সেই শিশুর মধ্যে আর কোনো কোনো চিহ্ন আপনার মনে আছে? ধারাদেবী বললেন— হ্যাঁ শিশুকে আমি যখন কোলে নিতাম— তখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, আমার শিশুর শরীরে সাতটি উজ্জ্বল তিল ছিল। আর একটি অনুজ্জ্বল। আমি স্বামীকে বলতাম— সপ্তর্ষী মণ্ডলের সাতটি তারকা আমার শিশুর শরীরে রয়েছে। সাতজন ঋষি এই শিশুর শরীরে তিলগুলি এঁকে দিয়েছেন। আমি স্বামীকে বলতাম— আমার এই শিশু বাবার মতো ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ হবে। তিলগুলি ভালো করে নিরীক্ষণ করার পর ধারাদেবী হারানো পুত্রকে ফিরে পেয়ে আকুল কান্নায় পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন। মাতা-পুত্রের মহামিলন মঞ্চটিতে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন। ধৈর্যচ্যুত হয়ে বরাহ পণ্ডিত খনার পিতৃদেব বারুইরাজকে জড়িয়ে ধরায় আকুল কান্নায় ভেসে গেলেন, তখন সভায় নেমে এল মহামিলনের আনন্দাশ্রু। *(ক্রমশ)*

ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবলীপুরমের উপকূল মন্দির

কৌশিক রায়

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে তামিলনাড়ুর চেঙ্গালামত্তু জেলার অন্তর্গত মহাবলীপুরম বা মামল্লপুরমে সম্পূর্ণ গ্র্যানাইট পাথর বা আগ্নেয় শিলার ব্লক থেকে ৬৩০ থেকে ৬৮৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, পল্লব রাজবংশের অন্যতম নৃপতি--- প্রথম নরসিংহবর্মণের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে তোলা হয়েছিল একটি সুবিশাল মন্দির। এশিয়ার সাতটি প্যাগোডার মধ্যে অন্যতম হিসেবে মার্কোপোলো উল্লেখ করেছিলেন এই উপকূলীয় মন্দিরটিকে।

বিভিন্ন গুহামন্দির এবং একক পাথর থেকে বিভিন্ন রথ খোদাই করে যে অনুপম স্থাপত্যরীতির শুভসূচনা নৃপতি দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ করেছিলেন, তার পরিপূর্ণতা ঘটেছিল এই উপকূলীয় বা তটরেখা মন্দিরের সুচারু নির্মাণকার্যের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে ইতিহাসবিদরা জানাচ্ছেন--- দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ এই দেবালয়টির নির্মাণকার্য শুরু করলেও আনুমানিক ৭০০ থেকে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই মন্দিরটির সংস্কার এবং পরিবর্ধনের কাজগুলি করেন পল্লবরাজ রাজসিংহ। অবশ্য, ইনিই যে আসলে দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ, সেটাও বলেছেন বহু ইতিহাসবিদ। পল্লব রাজাদেরকে পরাভূত করে তামিলনাড়ুর দখল নেন চোল রাজারা। তাঁরাও এই মন্দিরের স্থাপত্যের সংস্কার করেন। তবে, ২০০৪-এর সুনামি বা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে এই মন্দিরটির বেশ কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে প্রাপ্ত তামিল ও ব্রাহ্মী লিপিতে খোদাই করা শিলালিপি থেকে জানা গেছে— এই উপকূল মন্দিরটি তিনটি ভাগে বিভক্ত--- ক্ষত্রিয় সিংহ পল্লবেশ্বর-গৃহম, রাজসিংহ-পল্লবেশ্বর- গৃহম ও পিল্লিকোণ্ডারুল্লিইয়া দেভার। বঙ্গোপাসাগর তীরবর্তী বলে এই সম্পূর্ণ মন্দিরটিকে 'জলশয়ন' বলেও অভিহিত করা হয়। মন্দিরটি হয়তো অনন্ত ক্ষীরোদসাগরে মহাযোগ নিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর কথা ভেবেও নির্মিত হতে পারে। কেননা মন্দিরগাত্রে 'নরসিংহ পল্লব বিষ্ণুগৃহ' বা পল্লব রাজাদের উপাস্য নরসিংহ বিষ্ণুর মন্দির— এই লেখাটি দেখা যাচ্ছে। এই মন্দিরটির অন্তর্ভুক্ত তিনটি মন্দিরগৃহ একই গ্র্যানাইটের বেদীর ওপর গড়ে তোলা হয়েছে। মহাবলীপুরমের একক প্রস্তরীয় ধর্মরাজরথ (জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের নামে উৎসর্গীকৃত)-এর সঙ্গে এই মন্দিরগুলির গঠনভিত্তিক সাদৃশ্য আছে। প্রধান মন্দিরটি পাঁচটি স্তরবিশিষ্ট। এখানে অধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটির ওপর পূর্বদিকে উদিত সূর্যের কিরণ, সরাসরি এসে পড়ে। প্রধান মন্দিরটি প্রায় ৬০ ফিট উচ্চতাবিশিষ্ট এবং ৫০ ফিট উচ্চতাযুক্ত একটি বর্গাকার বেদীর ওপর অবস্থিত। প্রধান মন্দির গৃহটিতে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের পাশাপাশি অর্কদেব বা সূর্যদেবের বিগ্রহও স্থান পেয়েছে।

এই উপকূল মন্দিরের গোপুরম বা প্রধান প্রবেশদ্বার যথেষ্ট কারুকার্যমণ্ডিত। শিখরগুলি ত্রিকোণ ও পিরামিডের মতো আকৃতিবিশিষ্ট। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে আক্রমণোদ্যত সিংহের মূর্তি আছে--- যেগুলি পল্লব রাজবংশের ক্ষাত্রবীর্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়। এছাড়া সিংহবাহিনী, দশভুজা দুর্গা, অর্ধশায়িত বিষ্ণু ও শিববাহন নন্দীর মূর্তিগুলোও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এই উপকূলীয় দেবালয়ের মধ্যে শিব, দুর্গা ও বিষ্ণু বিগ্রহের সহাবস্থান দেখে মনে করা হচ্ছে— পল্লব নৃপতিরা শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবপন্থীদের মধ্যে ধর্মীয় মেলবন্ধন ঘটানোর জন্যই এই মন্দিরটির নির্মাণের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। উপকূল মন্দিরটির দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যরীতির উজ্জ্বলতম নিদর্শন হলো,-ক্ষত্রিয় সিংহেশ্বর মন্দিরটির পূর্বদিকের ভিতরের দেওয়ালে ধরলিঙ্গ বা সোমস্কন্দ ঘরানায় খোদাই করা দেবাদিদেব মহাদেবের বিভিন্ন ভঙ্গিমার মূর্তি। মন্দিরটির প্রধান গর্ভগৃহে কালো ব্যাসল্ট পাথরের বানানো যে শিবলিঙ্গটি আছে, তার উচ্চতা প্রায় ৬ ফিটের মতো। উপকূল মন্দিরের কয়েকটি চূড়া অষ্টভুজাকৃতি। এগুলির ওপর পাথরের কলস বসানো আছে। উপকূল মন্দিরের একটি প্রাচীর খোদাই বা বাস-রিলিফে এক পদমূর্তি' শিবের দেহ থেকে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেবের আবির্ভাব দেখানো হয়েছে। আরেকটি পাথর— খোদাইতে দেখানো হয়েছে পাঁচ-ফণাযুক্ত সাপের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা ভূজঙ্গরাজ বাসুকীকে। শ্রীকৃষ্ণের কালীয়মর্দন এবং গরুড় বাহনে ইন্দ্রবাহন--- গজরাজ ঐরাবতকে বাঁচানোর দৃশ্যও এই মন্দিরগাত্রে বর্তমান।

এই উপকূল মন্দিরের সংলগ্ন এলাকাতে ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে পল্লবরাজ নরসিংহ মামাল্লার দ্বারা নির্মিত আরও একটি ছোটো আকারের শিবমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে এই উপকূল মন্দিরটিকে সমুদ্রের আগ্রাসন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছে ভারতের পুরাতাত্ত্বিক দপ্তর। সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে বাঁচানোর জন্য মন্দিরটির দেওয়ালে ওয়াটাল পালপের স্তর লাগোনো হয়েছে। মন্দিরটির চারপাশে পোঁতা হয়েছে ভূমিক্ষয় রোধকারী বিভিন্ন গাছগাছালি। □

প্রতিপদে নিরুদ্ধ
নটিনী বিনোদিনী

(বিনোদিনী দাসী বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। বস্তুত তিনি না থাকলে বাঙ্গালির বড়ো গর্বের স্টার থিয়েটারে গড়ে উঠত কি না, তাতে সন্দেহ থেকেই যায়। অথচ বিনোদিনী ইতিহাসে উপেক্ষিতা। স্বস্তিকায় তিন পর্বে প্রকাশিত হবে বিনোদিনীর জীবন ও অভিনয় নিয়ে একটি বিশেষ নিবন্ধ। এই সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্ব। —স্ব. স)

শেখর সেনগুপ্ত

কেবল গুরুমুখ নন, বিনোদিনীকে স্থায়ী রক্ষিতারূপে লাভের জন্য তৎকালীন কলকাতার বহু ধনী ব্যক্তিই ময়দানে নেমে পড়েছিলেন। তাঁরা পারস্পরিক বিবাদেও রত হন। টাকার জোরে একজন অন্যজনকে গোঁত্তা মারার চেষ্টা করেন। একাধিক এইরূপ ব্যক্তি বিনোদিনীকে অনুসরণ করে গিরিশ ঘোষের বাড়ি অবধি ধাওয়া করেছিলেন এবং গিরিশ ঘোষকে কয়েকবার পুলিশও ডাকতে হয়েছিল।

দুঃখের বিষয়, শেষ পর্যন্ত গিরিশ ঘোষই বিনোদিনীকে রাজি করান থিয়েটার হল নির্মাণের স্বার্থে গুরুমুখের স্থায়ী রক্ষিতা হয়ে যেতে। বিনোদিনী যেদিন তাঁর সম্মতি দেন, সেই দিনই গুরুমুখ একলপ্তে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দেন বিনোদিনীর হাতে। গিরিশ ঘোষ পুলকিত। তাঁর উন্মাদনায় বাংলা নাট্যশিল্প যেন উঠে দাঁড়াবার বল খুঁজে পেল। গ্রীষ্মের তপ্ত দিনগুলিতেও অভিনেতা- অভিনেত্রীরা পালা করে হল নির্মাণের তদারকিতে নেমে পড়লেন। তাঁদের অনেকেরই অভিমত, 'এই থিয়েটার হলের নাম রাখা উচিত বিনোদিনী থিয়েটার'। কথাটি বিনোদিনীর কানে পৌঁছায়। তিনি ওঁদের জানিয়ে দিলেন, 'ওরকম আজগুবি কথা বলবি না। নাট্যমঞ্চের ইজ্জত নষ্ট হবে।'

বিনোদিনী স্পষ্ট বুঝেছিলেন, তাঁর মতো একজন রক্ষিতার নামে যদি কোনও নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয়, ইতিহাস কলঙ্কিত হবে। 'আমি প্রাণ থাকতে সেই রকম সম্ভাবনাকে আহ্বান জানাতে পারি না। কেনই-বা অমন হাস্যকর তকমার কথা এরা ভাবতে পারল?'

আজ আমরা বুঝতে পারছি, বিনোদিনীর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েছে। ছমছমে পরিবেশের মানুষ গিরিশ ঘোষও দায় এড়াতে পারেন না। যাঁর দেহ, রূপ, যৌবন এবং শ্রমকে বাজারজাত করে 'স্টার থিয়েটার'-এর নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠালাভ, সেই বিনোদিনীকে থিয়েটার হলের আংশিক মালিকানাও তো দেওয়া হয়নি।

জুলাই ২১, সন ১৮৮৩, স্টার থিয়েটারের শুভ উদ্বোধন সূচিত হলো গিরিশ ঘোষের দ্বারা 'দক্ষযজ্ঞ' নাটকের মাধ্যমে। বাঙ্গলার নাট্যপ্রিয় মানুষদের সেদিন কী ভিড় হলের সামনে! শত শত নারী ও পুরুষ উপস্থিত হয়েছিলেন স্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী হবার বাসনায়। টিকিট নিয়ে খটাখটি, এমনকী হাতাহাতির উপক্রম। দক্ষরাজার ভূমিকায় গিরিশ ঘোষ এবং দক্ষকন্যা পার্বতীর ভূমিকায় নটিনী বিনোদিনী মঞ্চ মাতালেন। শুক্লপক্ষের দশমীরাতে বাংলা নাটকের ইতিহাসে এমন একটি অবিস্মরণীয় পর্ব রচিত হলো, যার মহিমার বিন্দুবিসর্গও ইতিপূর্বে কোনও মঞ্চে প্রত্যক্ষ করা

যায়নি। গিরিশ ঘোষ বনাম বিনোদিনী, কে যে কাকে অতিক্রম করে গেলেন, তা নিয়ে ডরপোক লোকেরাও বাজি ধরেছিলেন সেই রাতে। ক্রমে ক্রমে 'কমলে কামিনী', 'বৃষকেতু', 'হীরার ফুল', 'প্রভাসযজ্ঞ'— এই নাটকগুলিতে অভিনেত্রী বিনোদিনীর প্রতিভাদ্যুতি দর্শকদের একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহারা করে তুলেছিল। বিনোদিনীর টানেই তাঁরা এক-একজন প্রতিটি নাটক দেখতে কতবার করে যে স্টার থিয়েটারে হামলে পড়েছেন, তা একরকম হিসেবের বাইরে। এমনকী 'অমৃত বাজার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশির ঘোষই কবুল করেছেন যে, তিনি স্রেফ বিনোদিনীর অভিনয়ের টানেই দশ বারের বেশি স্টার থিয়েটার হলে গিয়ে বসে পড়েছেন সামনের সারিতে। নাটক শেষে একাধিকবার গ্রিনরুমে ঢুকে বিনোদিনীকে আপন মুগ্ধতার কথা অকপটে জানিয়ে এসেছেন।

এরপর 'চৈতন্যলীলা' নাটক। বিনোদিনী সেখানে বিষ্ণুপ্রিয়া। অতুলনীয় অভিনয়। সেই দিনগুলিতে বিনোদিনীই বাংলা নাট্যভুবনে একমেবাদ্বিতীয়ম্ সম্রাজ্ঞী। অনেকের অনেকরকম মতলব থাকলেও বিনোদিনীকে সিংহাসনচ্যুতা করবার সাধ্য কারোর হয়নি।

২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে এলেন স্টার থিয়েটারে নাটক 'চৈতন্যলীলা'র টানে। নাটক শেষে অভিভূত ঠাকুর বিনোদিনীর মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তুমি শতদলের ন্যায় বিকশিত। তোমার চৈতন্য লাভ হোক।' বিনোদিনীর অভিনয় দেখে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আসনে অনেকক্ষণ বসেছিলেন স্বয়ং বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা

বিনোদিনীকে নিশানা করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু কু গাইলেও তাঁর অনন্য প্রতিভাকে সেলাম ঠোকে। অন্যদিকে 'রিজন্ড' পত্রিকা একপাতা জুড়ে বিনোদিনীচর্চা করে,— যার অংশবিশেষ আমি এখানে তুলে ধরলাম :

She must be a woman of cinsiderable talent and culture. She has been able to show such unaffected sympathy with so many types of character and has proved that she is second to none on the stage of Bengal dramas. She is certainly an artist lady of much refinement of feeling as she shows herself to be one of inimitable grace.'

সাহিত্যিক রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁর বাছাই-করা জনাকয়েক জিগরি দোস্তদের নিয়ে মাঝে মাঝে বিনোদিনীর নিবাসে হানা দিতেন। মাদুর পেতে আড্ডা চলত তাঁদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা। উত্তেজক তরল পানীয় আসত। আলোচনা অনেক সময় যেন সালিশি সভার রূপ নিত। বিনোদিনী বয়সে ছিলেন তাঁদের সকলের ছোটো। কিন্তু রসিকতা করে এমন ভাব দেখাতেন, যেন এক বৃদ্ধা বয়সের ছোবলে মহাবিপাকে পড়েছেন বুঝি। অমৃতলাল এই নিয়ে যে কাব্যও করেছিলেন, তার প্রমাণ আমি এখানে তুলে ধরছি :

একত্র কতই মিত্র বসি এক সঙ্গে।
কাটিয়েছি প্রেম কাব্য রস রঙ্গে।।
হাসির কথায় নিশি হয়ে গেছে ভোর।
তথাপি ওঠে না কেহ ছাড়িয়া আসর।।
কত দিন কত রাত পিরিতে তোমার।
কাটিয়া গিয়াছে সখী প্রমোদে অপার।।
কে ধারিত সে সময়ে সময়ের ধার।
কবিতা মদিরা আর আছে থিয়েটার।।
আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার।
বিনির বাড়িতে যাই খাইতে বিয়ার।।

স্টার থিয়েটারে বিনোদিনীর শেষ অভিনয় ১ জানুয়ারি, ১৮৮৭। নাটকের নাম 'বেল্লিক বাজার'। সেখানে তাঁর অভিনয় এক বাঈজীর চরিত্রে। বয়স সবে তেইশ। এরই মধ্যে অত তিক্ত ও মধুর অভিজ্ঞতা! শান্ত আচরণ। অত প্রসংশার কেন্দ্রে থেকেও অহংকারশূন্য। লাগাতার নাট্যচর্চা ও লেখালেখি। তারপর হঠাৎ একদিন নাটকের জগৎ থেকে পুরোপুরি সরে এলেন। কেন তিনি মঞ্চে আর ফিরে এলেন না, আজও সেই রহস্যভেদ সম্ভব হয়নি।

১৯৬৫ সনে আমি তখন বর্ধমান শহরে অধ্যাপনা করি, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়। ওই শহরেই থাকতেন কবি ও অনুবাদক কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়। আমি তাঁর স্নেহভাজন ছিলাম। কামাখ্যার ভগ্নীপতি ছিলেন খ্যাতনামা শিল্পী, লেখক ও চিত্রপরিচালক পূর্ণেন্দু পত্রী। পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে একদিন বিনোদিনী সম্পর্কে

আলোচনায় বসেছিলাম। সেদিন পূর্ণেন্দুবাবু আমাকে যা বলেছিলেন, আমি এখানে তা হুবহু তুলে ধরলাম :

'...আমার কেরিয়ারের সূচনা বাঙ্গলার বিখ্যাত সিনেমা পত্রিকা 'রূপাঞ্জলি'তে। কাগজটির চাহিদা ছিল খুব। তাই আমাদের তাড়াহুড়োও ছিল যথেষ্ট। পত্রিকা সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় আমাকে প্রায় চোখে হারাতেন। সেই প্রাজ্ঞ মানুষটির অভিজ্ঞতাও ছিল অনেক। তাঁরই কাছ থেকে জানতে পারলাম, ১৯৩৯ সালে তিনি একবার গিয়েছিলেন বৃদ্ধা বিনোদিনীর কাছে তাঁর ইন্টারভিউ নিতে। অনেক কথা হবার পরও বিনোদিনী কিছুতেই জানালেন না কেন তিনি হঠাৎ চিরদিনের জন্য নাট্যমঞ্চ থেকে সরে এলেন। আজও সেই রহস্যভেদ করা গেল না।'

অভিনয়ে স্বকালে খ্যাতির মধ্যগগণে উঠেও বিনোদিনী ছিলেন অতি বিনয়ী। নিজের সম্পর্কে বলতেন কম। লজ্জায় সরে আসতেন। সচরাচর পরনিন্দা করতেন না। কালীশ মুখোপাধ্যায়কে নাকি বলেছিলেন, 'বিনোদিনী হলো ভাগ্যের দাসী। শেষ বয়সে পৌঁছেও যে ঈশ্বরবৃত্তিতে থাকতে হচ্ছে না, এটা ঠাকুরেরই আশীর্বাদ। আর আপ্তবাক্যের কী প্রয়োজন?'

মঞ্চ থেকে সরে আসবার পর হাবেলিতে নিজেকে গ্যারেজবন্দিনী করে রাখেননি। দুটি কাজে নিজেকে একেবারে সঁপে দিয়েছিলেন বিনোদিনী। প্রথম কাজ, পিতৃপরিচয়হীন কন্যা শকুন্তলাকে বিদূষী করে তুলতে হবে। দ্বিতীয় কাজ, সাহিত্যসাধনায় নিজেকে বেমালুম মগ্ন অবস্থায় তুলে আনতে হবে। এই কাজে তিনি থাকবেন একেবারে একক। তাঁকে দেখভাল করবার জন্য কাউকে বহাল করবেন না।

বিনোদিনীর প্রথম বাসনাটি অপূর্ণই থেকে যায়। শকুন্তলা তো এক পতিতার কন্যা। তার কোনও পিতৃপরিচয় নেই। তাই কলকাতার কোনও স্কুলই তাকে ভর্তি করতে রাজি হলো না। বিনোদিনীর শত অনুরোধ ও চোখের জলেও কাজ হয়নি। আর মরে গেলেও বিনোদিনী যে মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। বিনোদিনী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন, 'আমি মিথ্যার আশ্রয় লইতে এবং আত্মপ্রবঞ্চনায় ডুবু ডুবু হইতে শিখি নাই। যে সকল হতভাগিনীরা সুধা ভাবিয়া বিষপান করিয়া জীবনভর জর্জরিত হইয়া শ্মশানময় পরিবেশকে চিরতরে ত্যাগ করেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই জানেন, একজন বারাঙ্গনার জীবন কত দুঃখময়। ...অথচ এই বিপন্নাদের পদে পদে দলিত করিবার জন্য প্রতারকগণ সর্বক্ষণ ওৎ পাতিয়া থাকে। তাদের চাহিদা প্রকৃতই অতুলনীয়।...'

বাহাত্তর বছরের জীবনে সম্মান ও খ্যাতি যতই অর্জন করে থাকুন, লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। নিষ্ঠাবান হিন্দু রমণী ছিলেন। বাড়ি থেকে যথেষ্ট দূরত্বে অবস্থিত একটি দুর্গামন্দিরে মাঝে মাঝে যেতেন পুজো দিতে। মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে অশ্রুমোচন করতেন। স্বচরিত একটি কবিতায় বিনোদিনী জানিয়েছেন :

নীরব নিশীথ মাঝে কে ওই গাইছে কে?

গাইছে দুঃখের গান সমীরণে মিশে তান
ধীরে ধীরে স্বরমালা ভাসিয়া যাইছে রে?
শ্রান্ত ক্লান্ত স্বর ওই গগনে মিশায়
প্রফুল্লতা নাহি স্বরে তথাপি যে সুধা ঝরে
সুখস্বাদ অবসান নিরাশ আশায়।
বসিয়া বিজন দেশে কে বা ওই গায়
যেন সে মরম গাথা শরমে লুকায়
অতটুকু হৃদে তার সহে যে দারুণ ভার
আপনার প্রাণে সদা লুকাইতে চায়
তাই সেই মৃদু তানে সুধা ভেসে যায়।

বিনোদিনী মেয়ে শকুন্তলা মাত্র তেরো বছর বয়সে জ্বরাক্রান্ত হয়ে মধ্যরাতে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। সম্ভবত এক আকাট চিকিৎসকের ওষুধেই অসুস্থতা খুব বেড়ে গিয়েছিল কিশোরীটির। কন্যার নিথর দেহটিকে আঁকড়ে ধরে বিনোদিনী কয়েক ঘণ্টা পাথর হয়ে বসেছিলেন। রোজ রাতে চোখের জল ফেলতেন। অতপর জীবনের বাকি দিনগুলিতে বিনোদিনীর মগ্নতা ছিল কেবল কাগজ ও কলম নিয়ে। বাড়ির বাইরে খুব একটা বের হতেন না। আহার ছিল সংক্ষিপ্ত, কেউ দেখা করতে এলে কিছুটা সংকোচিত হতেন। পাড়ার যুবতীরা কলকল করতে থাকলে ঘরের

জানালা বন্ধ করে দিতেন। তাঁর তখন একটাই কাজ— অনর্গল লিখে যাওয়া। গদ্য, পদ্য, শ্লোক। যা লিখেছেন, তার বেশিরভাগটাই ছিড়ে কুটিকুটি করে ফেলছেন। কিছু থেকে গেছে। বিনোদিনীর যতগুলি লেখা আজ অবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তার অনেকগুলিরই সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য। লেখায় কোনও মুদ্রাদোষ বা অতি আকুলতা দেখা যায়নি। গোলদারির দোকান থেকেই কাগজ, কলম ও কালিভর্তি দোয়াত কিনতেন। দিনভর লেখালেখির দরুন দু'চোখে ক্লান্তির ছাপ এসে পড়ে। তাঁর অসাধারণ দৈহিক লাবণ্যে বিবর্ণতা স্পষ্টতর হয়। গিরিশ ঘোষ সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় বিনোদিনীর কবিতা। কবিতাটির নাম 'হৃদয় রতন'। আমি কবিতাটির কিছুটা অংশ এখানে তুলে ধরলাম :

এসো হে হৃদয়ে এক হৃদয়রতন।
অনন্ত শূন্যতায় সদা করি অন্বেষণ।।
বাসনা বিবশ আমি খুঁজিয়া তোমায়।
তাইতো কাতর প্রাণ স্মরণ যে চায়।।
জ্ঞানময় চিদানন্দ চৈতন্যস্বরূপ।
বিরাজিত আছে যাঁর প্রতিরোমকূপ।।
হেরিব কোথায় সেই বিশ্বের চেতন।
পরমাত্মা জীবাত্মায় কোথায় মিলন।।

কাব্যের বিচিত্ররূপ ফুটে উঠত বিনোদিনীর প্রতিটি কবিতায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁর অধিকাংশ কবিতাকেই আমরা উদ্ধার করতে পারিনি। সেই কালের বিশিষ্ট পত্রিকা 'ভারতবাসী' ধারাবাহিক ভাবে ছেপেছিল বিনোদিনীর তথ্যসমৃদ্ধ লেখা 'বাঙ্গলার রঙ্গালয়।' একচল্লিশটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হলো বিনোদিনীর কাব্যগ্রন্থ 'বাসনা'। ১৯০৫ সনে প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস 'কনক ও নলিনী'।

গিরিশ ঘোষই বিনোদিনীকে অনুপ্রাণিত করেছেন আত্মকথা লিখতে। বিনোদিনী আত্মকথা লিখতে শুরু করেন এবং প্রথম পর্বটি লেখা হলে সেটা পাঠিয়ে দেন গিরিশ ঘোষের কাছে তাঁর অভিমত জানবার জন্য। পাঠশেষে গিরিশ ঘোষ বিনোদিনীকে লিখে জানালেন, 'তোমার সারল্যে সমৃদ্ধ গদ্যভাষায় যে মাধুর্য রয়েছে, তাতে কোনও কাটাকুটির অবকাশ নাই। তুমি লিখে যাও।'

বিনোদিনীর হৃদয় ছিল করুণায় পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে হাড়হাভাতেরা এসে দাঁড়াত তাঁর দুয়ারে। আর্থিক স্বচ্ছলতা বিশাল না হলেও বিনোদিনী সাধ্যানুসারে তাদের সাহায্য করতেন। তিনি বিরক্ত হতে পারেন। —এ আশঙ্কা কারোর ছিল না।

জীবন যত শেষের দিকে এগিয়েছে, বিনোদিনী নিঃসঙ্গতা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি যেন নিজেকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন আবাসিক চৌহদ্দিতে। হতাশা ও নিঃসঙ্গতা তাঁকে গ্রাস করেছিল। ক্রমে লিখতেও তাঁর জড়তা আসে। একটা উঁচু মই-লাগান পালঙ্কে কাটত তাঁর নিদ্রাহীন নিশিকাল। নীচে ঘরময় ছড়ান থাকত বিস্তর বাংলা ইংরেজি বই। দৃষ্টিশক্তি ক্রমে কমে আসায় আর একটানা পড়ে যেতে অক্ষম। তবুও কালেভদ্রে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে চলে যেতেন স্টার থিয়েটারে। তখন যাঁরা তাঁকে সাদরে নিয়ে যেতেন ভিতরে, তাঁদের মধ্যে থাকতেন শিশির ভাদুড়ি, তারাসুন্দরী, প্রবোধ গুহঠাকুরতা প্রমুখ। রোজ বাড়িতে অনেকক্ষণ ধরে গোপাল ঠাকুরের পূজা করতেন। পরিশেষে ১৯৪১-এর ১২ ফেব্রুয়ারি নটিনী বিনোদিনী পুরোপুরি ঠাঁই নিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভুবনে। (শেষ)

গ্রন্থঋণ : 'আমার কথা'— বিনোদিনী দাসী। 'আমার অভিনেত্রী জীবন'—বিনোদিনী দাস। 'শহর কলকাতার আদি পর্ব'— পূর্ণেন্দুপত্রী। 'কবির বৌঠান'— মল্লিকা সেনগুপ্ত। 'বিনোদিনী গাঁথা'— দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ব্রাত্য বিনোদিনী'— নিখিল কুমার চক্রবর্তী।

ব্যক্তিগত ঋণ : কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, লেক কালীবাড়ির কর্ণধার নিতাই চন্দ্র বসু ও সৈকত সেনগুপ্ত। ◻

ডার্বি জেতার হ্যাট্রিক

নিলয় সামন্ত

সবুজ-মেরুন জনতার চোখের মণি হয়ে উঠেছেন রয় কৃষ্ণ। মাত্র তিন বছর রয়েছেন ক্লাবে। এর মধ্যেই পরপর তিনটি ডার্বিতে গোল করা সহজ কাজ নয়। অতীতে দিকপাল ফুটবলাররাও পারেননি। কিন্তু সেই কাজই যেন কত অনায়াসে করে দেখালেন ফিজির তারকা। গতবারের দুটি কলকাতা ডার্বির পর এ মরসুমের প্রথম ডার্বিতেও প্রথম গোল এল তাঁর পা থেকে।

মাঠে নামলে তাঁর মতো ক্ষিপ্র ফুটবলার খুব কমই রয়েছে। এ কারণেই কোচ আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাসের প্রিয় ফুটবলার তিনি। সেই ২০১৯-২০ মরসুমে তৎকালীন এটিকে-তে কৃষ্ণকে সই করিয়েছিলেন হাবাস। ওয়েলিংটন ফিনিক্স থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন তাঁকে। কলকাতায় এসে যাতে কৃষ্ণ একা না হয়ে পড়েন, তাই ওয়েলিংটন ফিনিক্স থেকে তাঁর সঙ্গী ডেভিড উইলিয়ামসকেও তুলে এনেছিলেন তিনি। দু'জনে মিলে ফুল ফোটালেন সবুজ ঘাসে।

সেই মরসুমে ১৫টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন কৃষ্ণ। দলকে ট্রফি জিতিয়েছিলেন। পরের বছর মোহনবাগানের সঙ্গে জুড়ে যায় এটিকে। ক্লাবের নাম বদলে গেলেও বদলাননি কৃষ্ণ। তখন শুধু এটিকে সমর্থকদের পাশে পেতেন। এবার তাঁর পাশে চলে এলেন লক্ষ লক্ষ সবুজ-মেরুন সমর্থক। প্রথম কলকাতা ডার্বিতে গোল করে সমর্থকদের মন জয় করে নিলেন ফিজির অধিনায়ক। তারপর থেকে ডার্বি মানেই তাঁর গোল। যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত মরসুমেও ফাইনালে উঠেছিল এটিকে মোহনবাগান। কৃষ্ণ ১৪টি গোল করেন। এবার দু' ম্যাচেই দুটি গোল হয়ে গেল।

গতবার প্রথম ম্যাচেই কলকাতা ডার্বিতে খেলতে নেমেছিল এমসি ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল করেন কৃষ্ণ। দ্বিতীয় ডার্বিতে ১৫ মিনিটে গোল করেন। তৃতীয় ডার্বিতে আরও আগে, ১২ মিনিটে গোল করলেন। অর্থাৎ যত ম্যাচ এগোচ্ছে, কৃষ্ণের গোল করার সময়ও যেন ততটাই এগিয়ে আসছে। এবারের আইএসএল-এর দ্বিতীয় দফার ডার্বির তারিখ এখনও ঘোষিত হয়নি। কিন্তু সবুজ-মেরুন জনতা এখন থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে তাঁকে নিয়ে।

গত শনিবার শততম ডার্বিতে এসসি ইস্টবেঙ্গলকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিল এটিকে মোহনবাগান। ঘেলার শুরু থেকেই দাপট ছিল মোহনবাগানের। ১২ মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন রয় কৃষ্ণ। সেই গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের গোল। এবার মনবীর সিংহ। যিনি গোল করলে এটিকে মোহনবাগান হারে না। হারেওনি। মুহুর্মুহু আক্রমণে তখন দিশেহারা লাল-হলুদ রক্ষণ। গত মরসুমে মোহনবাগানে খেলা অরিন্দম ভট্টাচার্য কী করবেন বুঝেই উঠতে পারছেন না। মনবীরের গোলের সময় যে পোস্ট গার্ড নিয়েছিলেন, সেখান থেকেই গোল খেলেন তিনি।

২২ মিনিট ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেন লিস্টন কোলাসো। হুগো বুমোসের বাড়িয়ে দেওয়া লম্বা থ্রু ধরে নেন লিস্টন। তাঁকে আটকাতে গোল ছেড়ে এগিয়ে আসেন অরিন্দম। লাল-হলুদ অধিনায়ককে ধরাশায়ী করে ফাঁকা গোল খুঁজে নিলেন লিস্টন। ৩-০ গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান।

চোটের জন্য মাঠ ছাড়তে হলো তাঁকে। কোচ ম্যানুয়েল দিয়াস নামিয়ে দিলেন তরুণ শুভম সেনকে। প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকেই শেষ করে মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধেও লাল-হলুদকে চাপে রেখেছিল মোহনবাগান। গোটা ম্যাচে গোলমুখী শটই নিতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। বার বার আক্রমণে উঠে আসছিলেন রয় কৃষ্ণরা। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নিতেই পারতেন তাঁরা। নিজেদের ভুলেই তা হলো না।

এটিকে মোহনবাগানের কাছে ০-৩ গোলে হারের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ হোসে মানুয়েল দিয়াজের গলায় দুটি স্বীকারোক্তি। প্রথমত তিনি, মেনে নিলেন, তাঁর দলের সঙ্গে এটিকে মোহনবাগানের মানের তফাত অনেকটাই। দ্বিতীয়ত, তাঁর দল অজস্র ভুল করেছে। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে দিয়াজ বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে খুবই ভালো একটা দল নেমেছিল। প্রতিপক্ষ হিসেবে বেশ কঠিন। যার ফলে পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে।'

২৩ মিনিটে তিন গোল করা নিয়ে লোপেজ বলেন, 'আমাদের ছেলেরা একাধিক গুরুতর ভুল করেছে। দুর্দান্ত ও বিপজ্জনক একটা দলের বিরুদ্ধে এ রকম ভুল করলে চলে না। আমরা নিজেদের খেলাটা খেলতেই পারিনি।' কয়েক দিনের মধ্যেই ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ। দিয়াজ বলেন, 'লিগের যা নিয়ম, যে রকম সূচি, তা তো মেনে চলতেই হবে। তিন দিনের মধ্যেই পরের ম্যাচে নামতে হবে।'

মাঝমাঠে মোহনবাগান টেক্কা দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। প্রশ্ন উঠেছে হুগো বুমোসকে আটকাতে না পারা নিয়ে। দিয়াজের বক্তব্য, 'বিপক্ষের ফুটবলারদের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের দূরত্ব সব সময়ই ছিল। বুমোসের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সে রকমই হয়েছে। ওর কাছাকাছি পৌঁছানোর সুযোগই বেশি পায়নি আমাদের ছেলেরা।' টানা তিনটি ডার্বি ম্যাচ হারতে হলো। সমর্থকদের উদ্দেশে দিয়াজের বার্তা, 'সমর্থকদের কষ্টটা বুঝতে পারছি। তবে এই মুহূর্তে এটিকে মোহনবাগান ও এসসি ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ফারাক আছে। আর এটাই বাস্তব।' ▯

শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা ফেলুদা

হ্যারিপটার , উফ্ কী এক্সাইটিং অ্যাডভেঞ্চার! – লাফিয়ে উঠে বলল কাঁকন। সাতবছরের ছোট্টো কাঁকন এখন বেশ বড়োদের মতো কথা বলতে শিখেছে।

পাশেই বসে বারো বছরের তিন্নি। দিদি-বোনের মধ্যে কী সুন্দর মিষ্টি সম্পর্ক হলেও কখনো মেঘ, কখনো রোদ্দুর। খুনসুটি লেগেই থাকে। কিন্তু একে ছাড়া অন্যজন একদণ্ডও থাকতে পারে না। তিন্নি বলল, প্লিজ কাঁকন, চেঁচাস না। দেখছিস আমি হোমওয়ার্ক করছি। আর বাই দি ওয়ে, হ্যারিপটার কোনো অ্যাডভেঞ্চার গল্প নয়, ওটা পুরো ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড। শুনে কাঁকনের খুব রাগ হলো। যখন-তখন দিদি আমায় ইনসাল্ট করে। – মা, ও মা, কাঁকন আরও জোরে চিৎকার করে উঠল।

মা রান্নঘর থেকে ছুটে এসে বললেন, কী হয়েছে, আবার তোরা শুরু করেছিস! কী নিয়ে ঝগড়া শুনি? ভিডিয়ো গেম না ইউটিউব চ্যানেল? তিন্নি বলল, দেখো না মা, বোনকে কিছু বলা যায় না। কিছু বললেই চিৎকার করতে থাকে। এরই মধ্যে ওদের বাবা পাশের ঘর থেকে এসে বললেন, কী হয়েছে কাঁকন? -- দেখো না বাবা, দিদি শুধু আমায় বলে আমি কিছু বুঝি না। হ্যারিপটারে নাকি অ্যাডভেঞ্চার নেই। – ও এই কথা, আর এই নিয়ে তোদের ঝগড়া? তোরা হ্যারিপটারের মধ্যেই আটকে আছিস, এসব থেকে এবার একটু বের হতে হবে। হ্যারিপটারে কী অ্যাডভেঞ্চার খুঁজছিস? বইমেলায় তোদের যে কাকাবাবু আর ফেলুদা সমগ্র কিনে দিলাম সেগুলো কি তাকে সাজিয়ে রাখার জন্য? বের করে নিয়ে আয় দেখি। তিন্নি একছুটে ড্রইংরুম থেকে নিয়ে এল সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা গল্পের সিরিজ 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। বাবা বইগুলো হাতে নিয়ে বললেন, জানিস, সত্যজিৎ রায় কে ছিলেন? তিনি ছিলেন বিশিষ্ট ভারতীয় চলচ্চিত্রকার।

– চলচ্চিত্রকার মানে কী বাবা, কাঁকন বলল। বাবা বললেন, চলচ্চিত্রকার মানে হলো যিনি সিনেমা তৈরি করেন। সত্যজিৎ ছিলেন ভারতীয় সিনেমা জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। এছাড়া একই সঙ্গে তিনি ছিলেন চিত্রনাট্যকার, শিল্প নির্দেশক, সংগীত পরিচালক ও সাহিত্যিক। তোদের মতো কচিকাঁচাদের জন্য তিনি রেখে গেছেন 'এক ডজন গল্প'। এর মধ্যে গোয়েন্দা কাহিনির সেই বিখ্যাত ডিটেক্টিভ চরিত্র ফেলুদা হলো সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা চরিত্র। ফেলুদা সিরিজের 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি' প্রথম গল্প। তোরা পড়েছিস? তিন্নি মাথা নীচু করে বলল, না বাবা, পড়া হয়নি।

মা এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন। কাঁকনকে কোলে নিয়ে বললেন, মা, দিদির ওপর সবসময় রাগ করতে নেই, দিদি তোমার থেকে বড়ো। তারপর তিন্নিকে বললেন, তুই বোনের সঙ্গে ঝগড়া না করে এই গল্পের বইগুলো পড়ে শোনাতে পারিস না! জানিস, ফেলুদার গোয়েন্দাগিরিতে ফেলুদা একটি চিঠিতে হুমকি দেওয়ার রহস্য খুঁজে বের করেছেন। ফেলুদার এক নম্বর সহকারী তাঁর খুড়তুতো ভাই তপেশরঞ্জন মিত্র ওরফে তোপসে এবং লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি জটায়ু ছদ্মনামে পরিচিত। আর ফেলুদার আসল নাম কী বলতো ? প্রদোষচন্দ্র মিত্র। ফেলুদাকে নিয়ে অনেক সিনেমা আছে, যেমন সোনার কেল্লা, বাক্সরহস্য, হিরের আংটি, জয়বাবা ফেলুনাথ,আরও অনেক। তোদের জন্য ডিভিডি নিয়ে আসবো। তিন্নি লাফিয়ে বলে উঠল, না মা এখন আর কেউ ডিভিডিতে সিনেমা দেখে না। ইউটিউব খুললেই সব সিনেমা দেখা যায়। আমি আজই দুপুরবেলায় তোমার স্মার্টফোনে বোনকে নিয়ে সোনার কেল্লা দেখব।

কাঁকনের মুখখানা আনন্দে গদগদ। মা কাঁকনকে কোল থেকে নামিয়ে ওদের বাবার দিকে তাকালেন। বাবা বললেন, যাক, তোদের ঘাড় থেকে বিদেশি রহস্য গল্পের ভূত তাহলে নেমেছে। এবার থেকে সময় পেলে বাংলা গোয়েন্দা গল্পের বই আর সিনেমাগুলো দেখবি, তিন্নি আর কাঁকন আনন্দে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

@ অ দে

ভারতের বিপ্লবী

ত্রিপুরা সেনগুপ্ত

ত্রিপুরা সেনগুপ্তের জন্ম পূর্ববঙ্গের কুমিল্লায় ১৯১৩ সালের ১২ মে। বিপ্লবী দলের সদস্য হিসেবে ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অভিযানে তিনি অংশগ্রগণ করেন। তার আগে প্রস্তুতি পর্বে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন অফিসের সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁর উপর। সেই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন তিনি। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চারদিন পর জালালাবাদ পাহাড়ের সম্মুখ যুদ্ধে মাত্র সতেরো বছর বয়স হলেও বাহিনীর একজন সেনাপতির দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। জালালাবাদ পাহাড়েই ব্রিটিশ বাহিনীর গুলিতে ১৯৩০ সালের ২২ এপ্রিল তিনি বীরগতিপ্রাপ্ত হন।

জানো কী?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁদের কার্যকাল

৯) রাজীব গান্ধী ১৯৮৪ – ১৯৮৯

১০) ভি পি সিংহ ১৯৮৯– ১৯৯০

১১) চন্দ্রশেখর ১৯৯০-১৯৯১

১২) পি ভি নরসিমহা রাও ১৯৯১– ১৯৯৬

১৩) অটলবিহারী বাজপেয়ী ১৯৯৮–২০০৪

১৪) মনমোহন সিংহ ২০০৪–২০১৪

১৫) নরেন্দ্র মোদী ২০১৪– চলছে।

ভালো কথা

দুপুরবেলার আসর

সেদিন আমাদের বাড়িতে কলকাতার দাদু, মুরারীপুরের দাদু, দিদা,মাসি, মেসো ও বোন এসেছিল। দুপুরের খাওয়ার পর কলকাতার দাদু বললেন চলো আসর বসাই। সেইমতো বাবার পড়ানোর ঘরে শতরঞ্চি বিছিয়ে সবাই বসে পড়লাম। আমার দাদাভাই ও পাশের বাড়ির এক দাদাও এল। আমি তবলায় ধুন বাজালাম। আমার দাদা তবলায় লহরা বাজাল। পাশের বাড়ির দাদা গিটারে রাগ বাজানোর পর 'আগুনের পরশমণি' গান বাজাল। তারপর আমি রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' আবৃত্তি করলাম। আমার দাদা 'তেলের শিশি ভাঙল বলে' আবৃত্তি করল। সেদিনের আসরে আমি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। আসরে আমাদের বাড়ির সবাই বসেছিল।

রুদ্রাঙ্কুশ ঘোষ, তৃতীয় শ্রেণী, ত্রিমোহিনী, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

প্রস্তুতি নাও

স্বদেশ সেন, দ্বাদশ শ্রেণী, ঝালদা, পুরুলিয়া।

যেতে যেতে যায় না
মরেও যে মরে না
কী ভয়ংকর ভাইরাস,
রাত-দিন হাত ধোওয়া
দুই ডোজ টিকা নেওয়া
তবু নেই স্বস্তির শ্বাস।

আসছে তৃতীয় ঢেউ
ভয়ে পাগল কেউ কেউ
ঘর থেকে বেরোয় না আর,
আমি বলি কেন ভয়
প্রথম দুটিকে তো করেছি জয়
এখনই প্রস্তুতি নাও তার।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

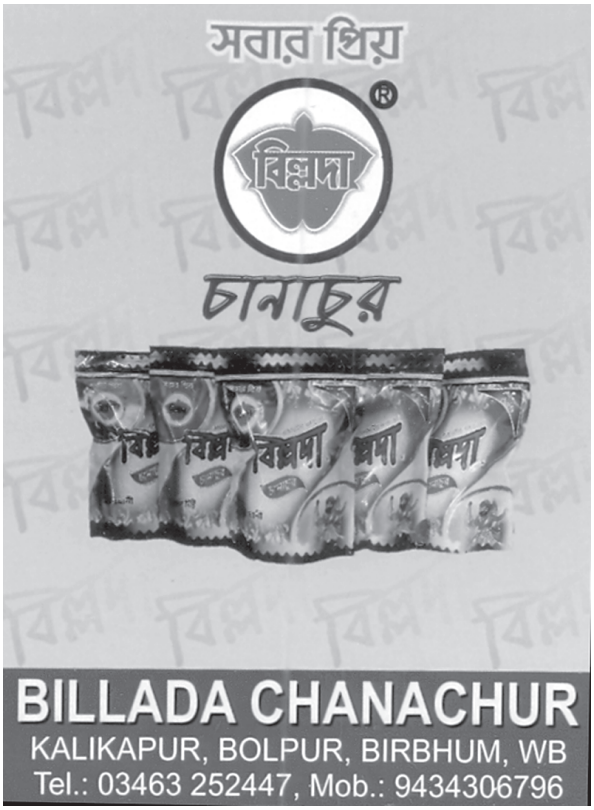

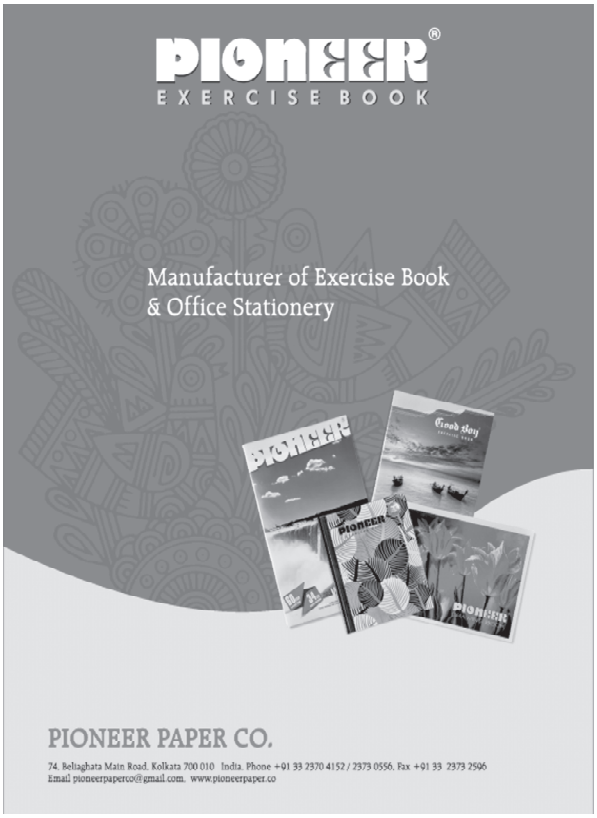

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বিজ্ঞান শিক্ষায় ঔপনিবেশিক দাসত্বের ইতিহাস

পিন্টু সান্যাল

তৃতীয় পর্ব

আরবকে জ্ঞানের বাহক এবং গ্রিসকে সমস্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবে প্রমাণ করতে পারলে সেই জ্ঞানকে গ্রহণ করতে উপাসনা-পদ্ধতিগত বিশ্বাসে কোনো বাধা থাকে না। ইতিহাসের ঘটনাক্রমের সামান্য যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ এই মিথ্যাচারকে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট।

নবম শতাব্দীতে বাগদাদের ব্যাত-আল-হাকিমা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত বিশেষত ভারতবর্ষ, পার্সিয়া, চীন থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান সংগ্রহ করেছিল। তারা যদি মনে করতো পৃথিবীর সকল জ্ঞানের উৎস গ্রিস, তাহলে জ্ঞানের প্রবাহ হতো গ্রিক থেকে আরবি ভাষাতে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ উলটো কথা বলে। বাগদাদের লাইব্রেরিতে আরবিতে অনুদিত জ্ঞানকে পরবর্তীকালে গ্রিসের বলে প্রচার করা হয়।

ব্যাত-আল-হাকিমার (Baghdad House of Wisdom) জ্ঞানের উৎস :

ইসলামীয় আরব ভারতবর্ষ থেকে পাটীগণিতের বিভিন্ন পুঁথি বিশেষ করে আর্যভট্ট, বরাহমিহিরের বিভিন্ন গ্রন্থ জোগাড় করে ব্যাত-আল-হাকিমা-তে আরবি ভাষায় অনুবাদ করে (আর-খোয়ারজমির 'হিসাব-আল-হিন্দু')। আমরা জানি যে রোমান অঙ্কে কোনো সংখ্যা লেখা ও গণনা করা কত কঠিন। যেমন রোমান অঙ্কে ৮ লেখা হয় এইভাবে— VIII এবং ৯ লেখা হয় এইভাবে— IX। এখন ৩৪৭৮ সংখ্যাটি রোমান অঙ্কে লিখলে দাঁড়াবে এইরকম--- MMMCDLXXVIII. এইরকম চার অঙ্কের দুটো সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের নিয়ম কতটা কষ্টসাধ্য হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। গ্রিক-রোমানরা অঙ্ক লেখার এই পদ্ধতি নিয়ে কত উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-সাধনা করতে পেয়েছিল তাও বোঝা কষ্টকর নয়। আসলে, গ্রিকদের বড়ো কোনো সংখ্যা নিয়ে গণনার প্রয়োজনই হয়নি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় বড়ো সংখ্যার গণনা তারা করেইনি। কিন্তু ইউরোপে যখন বড়ো সংখ্যার গণনার প্রয়োজন হলো তারা আরবদের সংখ্যা লেখার পদ্ধতিকে অনুকরণ করলো। আরবীয় অঙ্ক 'স্থান-মান পদ্ধতি'তে লেখা হয়। এই স্থান-মান পদ্ধতি ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করে আল-খোয়ারজমি যার ল্যাটিন ভাষায় নাম হয়ে যায় অ্যালগরিসমাস। এই অ্যালগরিসমাস থেকেই অ্যালগরিদম কথাটির উৎপত্তি। ভারতীয় 'স্থান-মান পদ্ধতি'তে অঙ্ক লেখার পদ্ধতি অনুকরণ করেই ইউরোপে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ সহজ হলো। এবার 'স্থান-মান পদ্ধতি' একটু বুঝে নেওয়া যাক—

আমরা জানি, ৩৪৭৮-এ এককের ঘরের অঙ্ক— ৮, দশকের ঘরের অঙ্ক-৭, শতকের ঘরের অঙ্ক— ৪ ও হাজারের ঘরের অঙ্ক—৩। এককের ঘরের অঙ্ককে ১ দিয়ে, দশকের ঘরের অঙ্ককে ১০ দিয়ে, শতকের ঘরের অঙ্ককে ১০০ দিয়ে এবং হাজারের ঘরের অঙ্ককে ১০০০ দিয়ে

গুণ করে যোগ করলেই সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সংখ্যাটি হবে—

৩×১০০০+৪×১০০+৭×১০+৮×১=৩০০০+৪০০+৭০+৮=৩৪৭৮।

এটা পরিষ্কার যে, ভারতবর্ষের সংখ্যা লেখার পদ্ধতি আরবের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছায়। গণিতে ভারতবর্ষের অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম সংখ্যা লেখার 'স্থান-মান পদ্ধতি'।

আব্বাসীয় খিলাফতের সময়ে, খলিফার পার্সীয়-বৌদ্ধ বংশোদ্ভূত ওয়াজির (মন্ত্রী)-দের উদ্যোগে পার্সিয়া ও ভারতবর্ষ থেকে আনা বইগুলোর অনুবাদ শুরু হয়। এই পার্সীয়-বৌদ্ধ বংশোদ্ভূতদের 'বার্মাকিড' বলা হতো অর্থাৎ এরা বার্মাক (প্রমুখ)-দের উত্তরসূরি। বৌদ্ধ মঠ 'নববিহার'-এর প্রধানকে 'বার্মাক' বলা হতো। রশিদুন খিলাফতের সময়ে (৬৩৩-৬৫৪ খ্রিঃ) খলিফা উমরের (৬৫১ খ্রিঃ) নেতৃত্বে পার্সিয়ার সাসিনীয় (প্রধানত জোরাস্ট্রিয়ান ধর্মাবলম্বী) সাম্রাজ্যের পতন হলে এই বৌদ্ধ বার্মাকরা ইসলাম গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাসিনীয় সাম্রাজ্য কয়েক দশক ধরে খ্রিস্টীয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একদিকে বাইজান্টাইন আর অন্যদিকে খিলাফতের আক্রমণে চার শতাব্দীর (২২৪-৬৫১ খ্রিঃ) সাসিনীয় সাম্রাজ্যের পতন হলো।

বিভিন্ন উৎস থেকে বই অনুবাদ করার অভ্যাস বার্মাকিডদের আগে থেকেই ছিল। পার্থক্য এইটুকুই যে সাসিনীয় সাম্রাজ্যের সময় তারা পার্সি (পাহ্লভি) ভাষায় অনুবাদ করতো আর এখন খলিফার জন্য আরবিতে অনুবাদ করেছে।

ছোটোবেলায় আমরা সবাই নীতি শিক্ষামূলক গল্প পড়েছি বা শুনেছি যেখানে বিভিন্ন পশুপাখিকে চরিত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এই গল্পগুলোর উৎস প্রায় ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সংস্কৃতে লেখা 'পঞ্চতন্ত্র'। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনিগুলি পার্সি ভাষা থেকে আরবিতে অনুদিত হয় প্রায় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে। এর আগে সংস্কৃত থেকে পার্সি ভাষায় অনুবাদ করা হয় ৫০০ খ্রিস্টাব্দে। পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ আমাদের জ্ঞানের প্রবাহের দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দেয়। গ্রিক ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ হয় ১০৮০ খ্রিস্টাব্দে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্ত করা গেলেও পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে অস্বীকার করার উপায় নেই। এখনো ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দিরের দেওয়ালে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনি খোদাই করা আছে। পঞ্চতন্ত্র প্রমাণ করে যে জ্ঞানের প্রবাহ ভারত থেকে পার্সিয়া, পার্সিয়া থেকে আরব এবং আরব থেকে খ্রিস্টীয় ইউরোপ— এই পথেই হয়েছিল।

গ্রিকদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ অ্যালমাজেস্ট। অ্যালমাজেস্ট বাগদাদে এসেছিল পার্সিয়া থেকে; পাশের খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্য বাইজান্টাইন থেকে নয়। অর্থাৎ এমন প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায় যা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হতে হয় যে তথ্যের প্রবাহ বাগদাদ থেকে খ্রিস্টীয় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে হয়েছিল, উল্টোপথে নয়। এই সমস্ত তথ্য থেকে সহজেই বোঝা যায়, নবম শতাব্দীর পরবর্তী যে গ্রন্থগুলির উৎস গ্রিস বলে দাবি করা হয় তা মোটেও সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। পরবর্তীকালে আরবি থেকে অনুদিত গ্রন্থগুলিকে গ্রিসের বলে এই কারণেই দাবি করা হয় যাতে খ্রিস্টীয় ইউরোপ সেই জ্ঞানে নিজেদের অধিকার দেখাতে পারে এবং ইসলামীয় আরবকে সেই সমস্ত জ্ঞানের সৃষ্টিকর্তা নয়, শুধুমাত্র বাহক হিসেবে দেখাতে পারে।

আমরা দেখলাম খ্রিস্টীয় ইউরোপ যেমন টলেডোর লাইব্রেরিতে বিভিন্ন বইয়ের আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেছিল, তার আগে ইসলামীয় আরব একই কাজ বাগদাদে করেছিল বহু মূল্য প্রাচীন গ্রন্থগুলির অনুবাদ পার্সি ভাষা থেকে আরবিতে করে। অর্থাৎ বিশ্ববিখ্যাত বাগদাদ ও টলেডো লাইব্রেরির জ্ঞানচর্চা শুরু হয় অনুদিত বই থেকে। বাগদাদে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন যা কিছু সংযোজন হয়েছিল তার পেছনে এই অনুদিত গ্রন্থগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমরা দেখলাম, বাগদাদের লাইব্রেরির ঔজ্জ্বল্য ছিল পার্সিয়া থেকে আনা অনুদিত বইগুলোর জন্য। টলেডো হোক বা বাগদাদ জ্ঞান-সূর্যের আলো তারা শুধু প্রতিফলিত করেছিল, জ্ঞান-সূর্যের উদয় করাবার মতো সামর্থ্য এদের ছিল না। তাহলে কি পার্সিয়ার ছিল? পার্সিয়াতে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল? না; পার্সিয়া টলেডো ও বাগদাদের মতোই জ্ঞানের ব্রহ্মাণ্ডে এক গ্রহমাত্র, নক্ষত্র নয়। জানতে হলে আমাদের আরও অতীতে যেতে হবে।

বার্মাকিড নামে যাদের পরিচয় আমরা পেলাম তারা তাদের পুরোনো অভ্যাসকেই বাগদাদে অব্যাহত রেখেছিল অর্থাৎ প্রাচীন পুঁথির অনুবাদই ছিল তাদের কাজ। পার্সিয়াতে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান জিজ-ই-শাহরিয়ার নামে অনুদিত হয়।

পার্সিয়ান সম্রাট প্রথম খসরু (৫৩১-৫৭৯ খ্রিঃ) ভারতবর্ষে নিজের মন্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন জ্ঞানের সন্ধানে, এথেন্স বা আলেকজান্দ্রিয়াতে নয়। দাবা খেলার পদ্ধতি, পঞ্চতন্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতের নিয়ম ভারতবর্ষ থেকে পার্সিয়াতে যায়। যদিও সেই সময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে কিছু নেওয়া খসরুর পক্ষে যথেষ্ট সহজ ছিল। কারণ দুর্বল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সেই সময় খসরুকে যুদ্ধবিরতির জন্য কর দিতে বাধ্য ছিল এবং বাইজান্টাইনের দার্শনিকরা শরণার্থী হয়ে পার্সিয়াতে আশ্রয় নিয়েছিল। আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে, সেই সময় গ্রিকদের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান আয়ত্তের মধ্যে থাকলেও (যদি তার অস্তিত্ব থেকে থাকে!) খসরু কেন তা অনুবাদের উপযুক্ত মনে করেননি এবং সুদূর ভারতবর্ষ থেকে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান শিখতে কেন নিজের মন্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন।

অর্থাৎ আমরা দেখলাম অন্ধকার যুগ থেকে শুরু করে ক্রুসেডের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত ইতিহাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রিকদের উৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয় না। এই সমস্ত তথ্য থেকে আমাদের কি এই সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক হবে যে, সাধারণ গণনা করার মতো ক্ষমতা গ্রিসের না থাকায় গ্রিকরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল যতদিন না পর্যন্ত অনুদিত আরবীয় পুঁথির মাধ্যমে নবম শতাব্দীতে ভারতীয় জ্ঞান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে খ্রিস্টীয়-গ্রিকদের কাছে পৌঁছায়?

আরবীয় বইগুলোর উৎস হিসেবে গ্রিসকে দেখানোর গল্প এই কারণেই ছড়ানো হলো যাতে ক্রুসেডের পূর্ববর্তী সমস্ত জ্ঞানের স্রষ্টা হিসেবে গ্রিসকে দেখানো যায়— যে গ্রিস এতদিনে নিজেদের পুরোনো সংস্কৃতি ভুলে বা পরিবর্তন করে সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টীয় উপাসনা-পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। আর প্রাচীন গ্রিকদের কৃতিত্ব স্বীকার করলে নতুন ইউরোপের হীনমন্যতার কারণ নেই, যেহেতু প্রাচীন গ্রিকদের অনেক পরেই খ্রিস্টীয় উপাসনা পদ্ধতি প্রসারলাভ করে এবং দুই সংস্কৃতির সরাসরি সংঘাতের ইতিহাস এতদিনে বহু পুরাতন ও বিস্মৃত। □

প্রকৃতি নির্ভর জীবনযাপন এবং পূর্ণ স্বাস্থ্যের ভিত্তি

ড. অশোক কুমার বার্ষ্ণেয়

দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তি জীবনভর নিজে সুস্থ থেকে, সুস্থজীবনের আনন্দ অনুভব করতে চায়। এই ইচ্ছা পূরণের জন্য ব্যক্তি বিভিন্ন উপায় খোঁজার চেষ্টায় থাকে। নানাবিধ কার্যক্রম করতে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বাস্তবে ওই ব্যক্তি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে সুস্থ আছেন কি? কখনও কখনও ব্যক্তিগত ভাবে সুস্থ থাকলেও পারিবারিক ও ব্যবসায়িক সমস্যা সুস্থতার বাধা হিসেবে হাজির হয়। ওই অবস্থায় কী করণীয়? সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য কোনো ডাক্তার, অন্য কোনো ব্যক্তি, বস্তু কিংবা কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। নিজের স্বাস্থ্যের জন্য নিজেকেই চেষ্টা করতে হয়। বলা হয়েছে যে, My health is my Responsibility is the best policy। সম্ভবত, এই মনোভাবটাই ব্যক্তিকে সুস্থ রাখার সর্বাধিক সাহায্যকারী মনোভাব বা ব্যবস্থা।

পরিবার, সমাজ ও প্রকৃতির অন্য যে সব স্থায়ী ব্যবস্থা আছে, যেমন— সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, জলবায়ু, ঋতু, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি অপরিবর্তনীয়। এই অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থাগুলি যেমন আছে তেমন ভাবেই স্বীকার করতে হবে। এগুলি অস্বীকার করা ব্যক্তির হাতের বাইরে। এটাও পূর্ণ স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। তাছাড়া অন্য যে সকল প্রচেষ্টা আমরা করতে পারি সেই সকল প্রচেষ্টাকে অতিরিক্ত সুবিধা হিসেবে দেখা যেতে পারে।

বিগত ১৮-১৯ মাস ধরে সম্পূর্ণ দেশ এবং বিশ্ব করেনা মহামারীর প্রকোপে আছে। বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেছেন প্রকোপের সম্ভাবনা প্রবলভাবে থাকছে। বর্তমানে আমরা এমন এক অদ্ভুত অবস্থায় আছি যে এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার মতো কোনো সঠিক ওষুধ হাতের কাছে নেই। কেবল অসুখের লক্ষণ অনুযায়ী এবং সাবধানতা অবলম্বন দ্বারাই চিকিৎসা চলছে। এই পরিবেশে সর্বাধিক যে বিষয়টি নিয়ে বিশ্বজুড়ে আলোচনা হচ্ছে— সেটা রোগ প্রতিরোধক শক্তি। সুস্থতার এ এমন একটি দিক যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় না, কিন্তু এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। যেমন শরীরের প্রাণবায়ু দেখা যায় না কিন্তু প্রাণবায়ু ছাড়া জীবনের কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

আয়ুর্বেদ অনুসারে এই প্রতিরোধক শক্তি সাত প্রকার। সাধারণত প্রথম তিন প্রকার প্রতিরোধ ক্ষমতার চর্চা বেশি হয়ে থাকে। (১) সহজাত প্রতিরোধক শক্তি— এই শক্তি জন্মের সময় মাতা-পিতার থেকে সন্তান প্রাপ্ত করে। মাতা-পিতার মধ্যে এই ক্ষমতা যেমন যেমন থাকে সন্তানও তেমন তেমন পেয়ে থাকে। (২) সংকলন বা কালজ শক্তি— এ শক্তি জলবায়ু ও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যক্তির মধ্যে বিকশিত হয়। স্থান পরিবর্তনের ফলেও সংকলন শক্তির প্রভাব পড়ে। (৩) অর্জিত শক্তি— এ শক্তি ব্যক্তির প্রচেষ্টা, অভ্যন্তরীণ বায়ু, জীবন শৈলী ও চিন্তা-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। (৪) অগ্নিশক্তি— আয়ুর্বেদ অনুসারে ১৩ প্রকার অগ্নি আছে— যেটা ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। (৫) স্রোতম শক্তি— শরীরের মধ্যস্থিত বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বের স্থিতি ও তার প্রভাব। (৬) মনোবল— এটা মানসিক অবস্থা। (৭) আত্মবল— নিজের উপর নিজের বিশ্বাস আত্মবলের ভিত্তি।

সহজ বল বা শক্তি অপরিবর্তনীয়। সংকলন বল জলবায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। কেবল অর্জিত বলই আছে যার দ্বারা বিভিন্ন প্রচেষ্টা করা যেতে পারে এবং এই প্রচেষ্টা অন্য চার বলকেও প্রভাবিত করতে পারে।

সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য বলতে ব্যক্তির শুধুমাত্র নিজে সুস্থ থাকা নয়, পারিবারিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক বায়ুমণ্ডল উপযুক্ত রাখার প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

যোগশাস্ত্রে পঞ্চকোষের বর্ণনা আছে। যথা— (১) অন্নময় কোষ (পার্থিব শরীর), (২) প্রাণময় কোষ (শ্বাস-প্রশ্বাস), (৩) মনোময় কোষ (মনস্থিতি), (৪) বিজ্ঞানময় কোষ (তর্কশক্তি) এবং (৫) আনন্দময় কোষ (অন্তরতম অনুভূতি)। এই রকম বলা হয় যে, কোনো ব্যক্তির যদি এই পঞ্চকোষ সক্রিয় অবস্থায় থাকে তবে ওই ব্যক্তিকে পূর্ণ সুস্থ বলে মনে করা যেতে পারে। প্রত্যেক কোষের উন্নতির জন্য পৃথক পৃথক প্রচেষ্টার কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। তাছাড়া ব্যবহারিক রূপেও অনেক প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। সাধারণভাবে অন্নময় কোষের জন্য সুস্থ জীবনশৈলী, প্রকৃতি নির্ভর জীবনযাপন, ঋতু অনুযায়ী আহার

বিহার, শুদ্ধ জল, পর্যাপ্ত নিদ্রা ইত্যাদি দরকার। বিভিন্ন প্রকার ব্যায়াম, যোগাসন, প্রাণায়াম ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তি নিজের শ্বাসের উপর নিয়ন্ত্রণ করে প্রাণময় কোষের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে। মনোময় কোষের জন্য পূজা-পাঠ, জপ, ধ্যান ইত্যাদি সহায়ক হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানময় কোষের জন অধ্যায়ন, স্বাধ্যায়, চিন্তন, চর্চা ইত্যাদি সহায়ক হয়। আর আনন্দময় কোষের পুষ্টির জন্য প্রকৃতির নিকট অবস্থান করে মনের গভীরে তার অনুভূতি অনুভব করে বাস্তবিক আনন্দ অনুভব করা। তাতেই আনন্দময় কোষ বর্ধিত হয়।

বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবের ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তির সুখ-সুবিধা বেড়েছে, যাতায়াতের ও খবরের গতি বেড়েছে, নতুন নতুন দিক খুলেছে তেমনি ব্যক্তিগত কাজের সময় বেড়ে যাওয়ার ফলে দিনচর্যা অব্যবস্থিত হয়ে পড়েছে। এই অব্যবস্থার কারণে আহার-বিহারও অব্যবস্থিত হয়ে গেছে। পরিণামস্বরূপ মানসিক চাপ বাড়ছে এবং জীবনশৈলী অব্যবস্থিত হয়ে পড়ছে। সংবাদে প্রকাশ, বর্তমানে অসুখের ৮৩ শতাংশ কেবলমাত্র অনিয়ন্ত্রিত জীবনশৈলীর কারণে হচ্ছে। ফলস্বরূপ সাধারণ ব্যক্তির চিকিৎসা খরচ বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ার অবস্থায় এসে গেছে।

এখানে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়ার প্রয়োজন, সেটা জীবন ও স্বাস্থ্যের প্রত্যেক বিন্দু একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে সবই প্রভাবিত হচ্ছে। যদি ব্যক্তির নিজের জীবনশৈলী সঠিক না থাকে তাহলে পারিবারিক স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব পড়বে এবং তার ফল আমরা সমাজের উপর দেখতে পাবো। সেই কারণে স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে প্রত্যেক বিন্দুর উপর একসঙ্গে চিন্তা করার দরকার। যেমন, কোনো ব্যক্তির যদি মধুমেহ থেকে থাকে তাহলে ওই ব্যক্তির নিজের দিনচর্যা, আহার-বিহার, আচরণ ও ভাবনা মধুমেহ রোগীর অনুরূপ থাকলে ওই ব্যক্তি সুস্থ থাকতে পারবে। ওই প্রকারে পরিবারের অন্য কোনো ব্যক্তি যাতে ওই রোগের প্রকোপে না পড়ে, তার জন্য পরিবারের অন্য সদস্যরাও ওই একই প্রকার দিনচর্যা, আহার-বিহার ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থিত অবস্থায় থাকবে। এই অবস্থায় সামাজিক স্বাস্থ্য ও যাতে ঠিক থাকে তার প্রচেষ্টাও করার প্রয়োজন আছে।

সাধারণ ভাবে প্রকৃতি নির্ভর দিনচর্যা পালন করার জন্য ব্রাহ্মমুহূর্তে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগেই ঘুম থেকে ওঠার প্রয়োজন, তার জন্য গভীর রাতে না শুতে গিয়ে একটু আগে ঘুমালে তবে সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা সম্ভব। আর এই কাজ যদি সম্পূর্ণ পরিবার করে তাহলে লাভও সম্পূর্ণ পরিবার পাবে। এক ব্যক্তির ব্যবস্থিত ব্যক্তিগত জীবন ওই পরিবারকে ব্যবস্থিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে। যদি পরিবারে এক ব্যক্তি আহার-বিহার, ঋতুচর্যা ও বিরুদ্ধ আহারের ব্যাপারে মনোযোগ রাখে তাহলে পারিবারিক জীবন ও সামাজিক ব্যবহারেও এই নিয়ম অতি সহজেই পালন করতে পারে। সাত্ত্বিক আহার, শুদ্ধজল, পরিমিত নিদ্রা, পারিবারিক স্বচ্ছতা ইত্যাদি পালন করার জন্য ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে নিয়ে এক সঙ্গে ভাবনা করার দরকার। সুস্থজীবনের জন্য প্রতিদিন সুর্যোদয়ের আগে জাগরণ, জাগরণের পর কম-বেশি কিছু জলপান করা, দুবার খাওয়ার মাঝে ৩-৪ ঘণ্টা ব্যবধান, রাত্রির খাওয়া ঘুমানোর ২-৩ ঘণ্টা আগে সারাদিনে অল্প অল্প করে যথেষ্ট জলপান। ঋতু অনুসারে আহার, পর্যাপ্ত নিদ্রা আবশ্যক। যখন এই ব্যবস্থা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়ে পড়বে তখন স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব দেখা দেবে।

শারীরিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য কিছু না কিছু ব্যায়াম, পদব্রজে ভ্রমণ, জগিং, খেলাধুলা, যোগাসন, প্রাণায়াম, লিফ্টের বদলে সিড়ি ব্যবহার করা, অল্প দূরের জন্য বাহন ব্যবহার না করা ইত্যাদি দিনচর্যাকে জীবনের আবশ্যক হিসেবে নেওয়ার প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য নিজের মান্যতা অনুসারে কিছু না কিছু পূজা, পাঠ, প্রাণায়াম, জপ, ধ্যান ইত্যাদি করলে সহায়ক হয়।

প্রকৃতি ও পরিবেশ শুদ্ধতার জন্য বৃক্ষরোপণ করে সবুজ বৃদ্ধি করা, প্রয়োজন অনুসারে জল ব্যবহার করা, জল অপচয় না করা, বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ রাখার জন্য প্লাস্টিক ব্যবহার যথাসম্ভব না করা ইত্যাদির প্রয়োজন। ওই সকল বিষয়ই ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই প্রভাব বজায় রাখার জন্য, ব্যক্তিগত জীবনে আগ্রহ, পারিবারিক জীবনে অভ্যাস সামাজিক জীবনে অভিযান ইত্যাদির প্রয়োজন।

প্রকৃতি ও পরিবেশের জন্য পরম্পরাগত বিষয়েও দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। যথা— যজ্ঞ, হোম, সন্ধিকালে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র, শঙ্খবাদন, দেশি ঘিয়ের অখণ্ড প্রদীপ প্রজ্বলন, ধূপ-ধুনা জ্বালানো। এটা নিয়মিত করলে পরিবেশ শুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে ইতিবাচক শক্তির বৃদ্ধি ঘটে এবং তার প্রভাব পারিবারিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের উপর পড়তে দেখা দেয়।

ব্যক্তিগত জীবনে সময়ের গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থিত দিনচর্যার মধ্যে থেকে কাজ করলে কাজের গুণবত্তা ও পরিমাণের আধিক্য দেখা যায়। লক্ষ্য সঠিক থাকার ফলে জীবনের সফলতাও শীঘ্র আসে। এই প্রকার অভ্যাস পারিবারিক জীবনে সমস্ত ব্যক্তির টেনশনমুক্ত পরিমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে সকল সদস্যের উন্নতির রাস্তা প্রশস্ত করে। তাছাড়া ব্যক্তির বিশ্লেষণ ক্ষমতা, স্বীকার্য মনোবুদ্ধি, নিজের ক্ষমতার জ্ঞান, ইতিবাচক চিন্তা, সহজ-সরল ভাব, আদান প্রদান, ব্যবহারিক ও যুক্তিপূর্ণ চর্চা টেনশন কম করতে সাহায্য করে।

যদি কোনো কারণবশত পরিবারের কোনো সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ে বা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, তাহলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধিত জ্ঞান, ঘরের মধ্যে পাওয়া বিভিন্ন মশলা, সহজে পাওয়া যায় এমন বনৌষধি, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদির দ্বারা রোগ কিংবা দুর্ঘটনার ভয়বহতা কম করতে সহায়কের ভূমিকা নিতে পারে।

প্রকৃতি নির্ভর জীবনচর্যা, ইতিবাচক চিন্তাভাবনা, নিজেদের মধ্যে মনোভাব আদান-প্রদান, সময়ের গুরুত্ব দেওয়া ইত্যাদির অভ্যাস কেবল ব্যক্তিকে নয় পরিবার ও সম্পূর্ণ সমাজকে সুস্থ রাখতে পারে। ইতিবাচক ব্যক্তিই জীবনের প্রকৃত আনন্দ অনুভব করতে পারে এবং এরূপ সুস্থ, ইতিবাচক, আনন্দময় সমাজ তৈরির জন্য নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী যোগদান আবশ্যক।

(লেখক আরোগ্য ভারতীর রাষ্ট্রীয় সংগঠন সচিব, ভাষান্তর : তপন কুমার বৈদ্য, আরোগ্য ভারতীর রাষ্ট্রীয় কোষাধ্যক্ষ)

বিশেষ আবেদন

ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সকলের সহযোগিতায় ৭৪ বছর ধরে স্বস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। স্বস্তিকা নিরপেক্ষ নয়, রাষ্ট্রীয়তার পক্ষে। রাষ্ট্রবাদী মানুষ হিসেবে আপনি যে কথা জানতে চান, স্বস্তিকার পাতায় আপনি তা পাবেন।

বাজার চলতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেখানে দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ থাকে না, অন্যান্য লেখার ভিড়ে আসল তথ্যটাই যেখানে হারিয়ে যায়, স্বস্তিকা সেখানে সত্যটাকেই তুলে ধরে। স্বস্তিকার লেখায় তখন আপনি মনের কথাটি খুঁজে পাবেন। এক কথায়, স্বস্তিকা জাগ্রত হিন্দু চেতনার তথা ভারতাত্মার কণ্ঠস্বর।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক হাল-হকিকত এবং প্রকৃত চিত্রটি জানতে হলে স্বস্তিকা পড়তে হবে। স্বস্তিকার প্রতিটি সংখ্যাই বিষয়, বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ভারতের পরম্পরা ও আধুনিকতার এ এক অসাধারণ মেলবন্ধন। পরিবারের সবার সঙ্গে বসে পড়ার মতো পত্রিকা।

এবছর স্বস্তিকা ৭৫ বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। এই উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী স্বস্তিকার গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২২, শনিবার এই গ্রাহক অভিযানের সূচনা। ৫০০ টাকা দিয়ে আপনিও স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহক হোন— এটাই আমাদের অনুরোধ। পূজাসংখ্যা-সহ এক বছরে প্রকাশিত স্বস্তিকার সব সংখ্যাই আপনি বার্ষিক গ্রাহক হিসাবে পাবেন। স্বস্তিকা আপনার সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার প্রত্যাশী।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্বস্তিকার ২৪ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের সংখ্যাটি 'স্বাধীনতা-৭৫' বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। এজন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বস্তিকা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকার শ্রীবর্ধনের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের রেট

প্রতি কলাম সেন্টিমিটার (কালো/সাদা) ১৫০্ টাকা

প্রতি কলাম সেন্টিমিটার (রঙিন) ২২৫্ টাকা

যোগাযোগ : জয়রাম মণ্ডল :
৮৬৯৭৭৩৫২১৫, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
বিজ্ঞাপন পাঠানোর শেষ তারিখ :
১০ জানুয়ারি, ২০২২

With Best Compliments from :

A

WELL WISHER

বিশ্বে জনপ্রিয়তম নেতা নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আবারও বিশ্বের জনপ্রিয়তম নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। আমেরিকার ডেটা ইন্টেলিজেন্স ফার্ম 'দ্য মর্নিং কনসাল্ট'-র সমীক্ষা অনুযায়ী, অনুমোদনের রেটিঙে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জনসন-সহ বিশ্বের ১৩টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের থেকে এগিয়ে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রে ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডোর, ইতালির প্রধানমন্ত্রী মারিও দ্রাঘি, জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট-সহ বিশ্বের বহু নেতাকে জনপ্রিয়তায় পিছনে ফেলে দিয়েছেন। তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জেইর বলসোনারোও রয়েছেন। এই সমীক্ষায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ স্থানে এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অষ্টম থেকে দশম স্থানে নেমে এসেছেন।

৮ হাজার কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সামগ্রী ক্রয়ের অনুমোদন

নিজস্ব সংবাদদাতা।। একটি শক্তিধর দেশের প্রতীক হলো সেনাবাহিনী। অমৃত মহোৎসবের বছরে দেশ উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে নতুন নতুন সংকল্প গ্রহণ করছে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অধীনে দেশের লক্ষ্য ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক শক্তিতে পরিণত করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গত বিজয়া দশমীর দিন প্রধানমন্ত্রী ৪১টি দেশের অস্ত্রকারখানার নতুন নকশার সঙ্গে ৭টি নতুন কোম্পানি শুরু করেছেন। সেই লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিল ৭০৬৫ কোটি টাকা মূল্যের অস্ত্র ও সরঞ্জাম কেনার অনুমোদন দিয়েছে। মেক ইন ইন্ডিয়ার অধীন দেশীয় সংস্থাগুলি থেকে এই টাকা সংগ্রহ করা হবে।

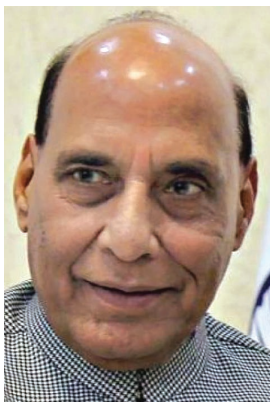

এর মধ্যে রয়েছে ডর্নিয়ার এয়ারক্রাফ্ট আপগ্রেড করা এবং হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড থেকে ১২টি হালকা ইউটিলিটি হেলিকপ্টার কেনা এবং ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড থেকে ইউ-২ নেভাল গানফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম সংগ্রহ করা যাতে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজের নজরদারি ও পরিচালন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

With Best Compliments from :

A

WELL WISHER

পুরনো বাতিল জিনিস বিক্রি করে সরকারের আয় ৪০ কোটি টাকা

সাত বছর আগে ২০১৪ সালে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে স্বচ্ছ ভারত মিশন অভিযান শুরু হয়েছিল তখন থেকে এটি একটি জনআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষার এই অভিযানের ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে, বেড়েছে দায়িত্ববোধ। গড়ে উঠেছে কোটি কোটি শৌচালয়। যত্রতত্র উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ বন্ধ হয়েছে। ভারতে দীপাবলি ও দুর্গাপূজার আগে বাড়িঘর পরিষ্কার করার ঐতিহ্য রয়েছে।

এবার কেন্দ্রীয় সরকারও গান্ধীজয়ন্তী থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সরকারি অফিসে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে। এই বিশেষ অভিযানের সময় বাতিল ফাইলপত্র চিহ্নিত করে সরানো হয়েছিল। কর্মস্থল পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে আবর্জনা ও অন্যান্য স্ক্র্যাপ সামগ্রী ও বাতিল জিনিস একত্রিত করে বিক্রি করা হয়। তা থেকে সরকারের আয় হয়েছে ৪০ কোটি টাকা।

ইউনেস্কোর কারুশিল্প-লোকশিল্প বিভাগে সৃজনশীল শহরের তালিকায় শ্রীনগর

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ ৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরের স্থানীয় কারুশিল্প বিশ্বমঞ্চে নতুন পরিচয় তৈরি করেছে। সম্প্রতি ইউনেস্কো দ্বারা প্রকাশিত সৃজনশীল শহরের তালিকায় এখন শ্রীনগরও স্থান পেয়েছে। ইউনেস্কোর সৃজনশীল শহর নেটওয়ার্ক কারুশিল্প ও লোকশিল্প, মিডিয়া আর্ট-সহ ৭টি সৃজনশীল ক্ষেত্রের কার্যকলাপের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন শহরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শ্রীনগরকে কারুশিল্প ও চারুকলা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৯০টি দেশের মোট ২৯৫টি শহর এখন এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই কৃতিত্বের বিষয়ে টুইট করার সময় বলেছেন, ‘ এটি শ্রীনগরের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে এক নতুন দিশা দিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণকে অভিনন্দন।’ সৃজনশীল শহরের তালিকায় শ্রীনগরের অন্তর্ভুক্তির জন্য ২০১৯ সালে প্রথম মনোনয়নের তথ্যপঞ্জী জমা দেওয়া হয়ছিল, কিন্তু সেই সময় দেশ থেকে শুধুমাত্র দুটি শহর বেছে নেওয়া হয়েছিল, রন্ধনশিল্পের জন্য হায়দরাবাদ ও চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য মুম্বাই। ২০১৯ সাল থেকে ভারতের মাত্র তিনটি শহর– জয়পুর, বারাণসী ও চেন্নাই এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ২০১৫ সালে জয়পুর কারুশিল্প ও লোকশিল্পের জন্য এবং বারাণসী সংগীতের জন্য এই সম্মান পেয়েছিল, অন্যদিকে চেন্নাই সংগীতকলায় অবদানের জন্য ২০১৭ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

জিএসটি সংগ্রহ ১.৩ লক্ষ কোটি টাকার বশি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিশ্বব্যাপী করোনার কারণে দেশের অর্থনীতি চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। সেই সময় ভারতের অর্থনৈতিক নীতিগুলি নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলন। অর্থনৈতিক তথ্য দ্বারা এই অনিশ্চয়তাগুলিকে দূর করা হয়েছিল যা ভারতের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক দক্ষতাকে তুলে ধরেছিল। এখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আবার জোয়ার এসেছে। গত অক্টোবরে যেখানে জিএসটি সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৩২৭কোটি টাকা, সেখান টানা চারমাস ধরে ম্যানুফ্যাকচারিং পারচেজিং ম্যানেজারস ইনডেক্স (পিএমআই) বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের পিএমআই অক্টোবর মাসে ৫৫.৯ হয়েছে যা সেপ্টেম্বরে ৫৩.৭ ও আগস্টে ৫২.৩ ছিল। পিএমআই ৫০-এর উপরে অর্থনীতির বৃদ্ধি হচ্ছে। জিএসটি সংগ্রহের এই পরিসংখ্যানটিও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জিএসটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংগ্রহ। এর আগে এবছরেরই এপ্রিল মাসে জিএসটি সংগ্রহ ১.৩ লক্ষ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে।

উজ্জ্বলা কার্বন নিঃসরণ কমিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ উজ্জ্বলা স্কিমটি২০১৬ সালে চালু হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল পুরানো প্রচলিত বাল্বগুলির পরিবর্তে নতুন এলইডি আলোর ব্যবহার করা, যা ভারতের মোট শক্তি খরচের ২০ শতাংশ বহন করে।

এ জন্য শহরে অর্ধেক দামে এলইডি বাল্ব দেওয়া হয়েছে, রাস্তার বাতি বদলে এলইডি দেওয়া হয়েছে। উজ্জ্বলা প্রকল্পের অধীনে, এপর্যন্ত ৩৬ কোটি ৭৮ লক্ষেরও বেশি এলইডি বিতরণ করা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত আট মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস পেয়েছে। এক বছরে, বিদ্যুতের ব্যবহার ৪৭ হাজার কিলোওয়াটের বেশি কমেছে, তাই প্রতি বছর গড়ে ১৯ হাজার কোটি টাকার বেশি সাশ্রয় হয়েছে।

উজ্জ্বলা প্রকল্পের বাইরে, এখন গ্রামীণ উজ্জ্বলা যোজনা শুরু হয়েছে, এর মাধ্যমে ৬০ কোটি পুরনো বাল্বগুলোকে নতুন এলইডি বাল্ব দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হবে, গ্রামে এগুলি ১০ টাকায় দেওয়া হবে।

উজ্জ্বলার মতো প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৯৯.৬ শতাংশ পরিবার এলপিজি গ্যাস ব্যবহার করতে পারছে, যা স্বাধীনতার ছয় দশক পর্যন্ত মাত্র ৫৫ শতাংশ ছিল।

এতে একদিকে যেমন কেরোসিন ও কাঠের মতো প্রচলিত জ্বালানি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অন্যদিকে ধোঁয়া থেকে সৃষ্ট মহিলাদের স্বাস্থ্য সমস্যাও দূর হয়েছে।

শিলিগুড়িতে স্বস্তিকা প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রবাদী ভাবধারার একমাত্র পত্রিকা স্বস্তিকা পত্রিকার উত্তরবঙ্গ প্রচার প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো গত ২১ নভেম্বর শিলিগুড়ি সূর্যসেন কলোনিস্থিত সারদা শিশু তীর্থে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, উত্তর মালদার প্রচার প্রতিনিধিরা। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন জলপাইগুড়ি সহ বিভাগ সঙ্ঘচালক উমেশ বর্মণ। পৌরোহিত্য করেন স্বস্তিকার সম্পাদক ড. তিলক রঞ্জন বেরা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি জেলার প্রচার প্রমুখ ডাঃ বিশ্ব প্রতিম রুদ্র।

উদ্বোধনী বক্তব্যে ড. বেরা স্বস্তিকার আগামীদিনের রূপরেখা নিয়ে আলোকপাত করেন। স্বস্তিকার ৭৫ বছর নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনার উল্লেখ করেন। স্বস্তিকার গ্রাহক অভিযানের দিন ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ঘোষণা করেন। শিলিগুড়ি প্রচার প্রমুখ ডাঃ বিশ্ব প্রতিম রুদ্র ডিজিটাল এবং অনলাইনের মাধ্যমে সকলের কাছে স্বস্তিকা পত্রিকা পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন। বৈঠকে সংগীত পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন মালদা জেলার প্রচার প্রতিনিধি পরেশচন্দ্র সরকার। বৈঠকের সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন জলপাইগুড়ি সহ বিভাগ সঙ্ঘচালক উমেশ চন্দ্র বর্মণ। বৈঠকের পুরো ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সারদা শিশু তীর্থের প্রধান আচার্য অনিরুদ্ধ দাস।

পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে উপকৃত হবেন বহু মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বর্তমানে পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে হলো দেশের দীর্ঘতম এক্সপ্রেসওয়ে, ৩৪৯ কিলোমিটার দীর্ঘ যা উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ, সুলতানপুর, ফৈজাবাদ, আম্বেদকরনগর, আজমগড়, বারাবাঁকি, আমেঠি, মৌ ও গাজিপুর-সহ ন'টি জেলাকে সরাসরি সংযুক্ত করবে। এটি বালিয়া পর্যন্ত বাড়ানো হবে। পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে চালু হলে ১০টি জেলার প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। এক্সপ্রেসওয়ের ধারে মান্ডি ও শিল্পও স্থাপন করা হবে।

● শিল্পের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা পূর্ব উত্তরপ্রদেশের জন্য এই এক্সপ্রেসওয়েটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। একে কেন্দ্র করে পাঁচটি শিল্প ক্লাস্টারও তৈরি করা হচ্ছে। অনুমান, এতে বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

● এক্সপ্রেসওয়ের চারপাশে খাদ্য পণ্য এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, পানীয়, পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য, রাসায়নিক পণ্য, অধাতব খনিজ পণ্য, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, চিকিৎসা ও দাঁতের সরঞ্জাম সম্পর্কিত শিল্প স্থাপন করা হবে।

● পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে যানবাহনের গতিসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়িকে ঘণ্টায় ১০০ কিমির বেশি গতিতে চলতে দেওয়া হবে।

● স্টেট এক্সপ্রেসওয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (UPEDA) দ্বারা তৈরি ছয় লেনের পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে ১৩টি ইন্টারচেঞ্জ তৈরি করা হয়েছে।

● এক্সপ্রেসওয়েতে ১১টি জায়গায় টোল ধার্য করা হবে। তবে আপাতত এই এক্সপ্রেসওয়েতে কোনও টোল ট্যাক্স নেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে। UPEDA-এর তরফে ছয়টি জায়গায় টোল প্লাজা ও পাঁচটি র‍্যাম্প প্লাজা তৈরি করা হয়েছে।

● হিসেব অনুযায়ী এই এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে প্রতিদিন ১৫-২০ হাজার যানবাহন চলাচল করবে। পশুর চলাচল রুখতে দুই পাশে বেড়া দেওয়া হয়েছে।

● সুলতানপুরের কুদেভারে যুদ্ধ বিমানের জরুরি অবতরণের জন্য এক্সপ্রেসওয়েতে একটি এয়ারস্লিপ তৈরি করা হয়েছে।

● এতে ১৮টি ফ্লাইওভার, সাতটি রেলওয়ে ওভারব্রিজ এবং সাতটি দীর্ঘ সেতু রয়েছে। একই সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন যান চলাচলের জন্য ১১৮টি ছোটো সেতু, ২৭১টি আন্ডারপাস ও ৫০৩টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।